এখন ডুয়ার্স

১৫-৩০ এপ্রিল ২০১৬। ১২ টাকা

কী রায় দিচ্ছে পাহাড়-তরাই-ডুয়ার্স ?

জোট ক্ষমতায় আসছেই!

মুখোমুখি অশোক ভট্টাচার্য

পাহাড়ে পালাবদলের আভাস?

তৃণমূল প্রার্থী হলে হেরে ভূত হতাম— হরকা

কংগ্রেসী ক্ষীরের মালপোয়ার দিকে নজর সবার

মিলেমিশে
ভোট দাও
•নববর্ষে•
শপথ নাও
মিলেমিশে
ভোট দাও
এপ্রিল-মে
আসছে দিন
বড়োরা সব ভোট
দিন

কী রায় দিচ্ছে পাহাড়-তরাই-ডুয়ার্স?
জোট ক্ষমতায় আসছেই!
মুখোমুখি অশোক ভট্টাচার্য
পাহাড়ে পালাবদলের আভাস?
তৃণমূল প্রার্থী হলে হেরে ভূত হতাম— হরকা
কংগ্রেসী ক্ষীরের মালপোয়ার দিকে নজর সবার
এখন ডুয়ার্স
মিলেমিশে ভোট দাও
নববর্ষে শপথ নাও মিলেমিশে ভোট দাও
এপ্রিল-মে আসছে দিন বড়োরা সব ভোট দিন

নতুন বছর আয়
নতুন কোন শপথ নিয়ে
নতুন জামা গা-য়!

মিথ্যেগুলো থাক্
সত্যি কথার ফুলঝুরিতে
পাল্টে যাওয়া যাক্!

স্বপ্ন নিয়ে ছোট্
দেশ ও দশের কথা ভেবেই
বড়োরা দিক ভোট!

আর মাথা নয় হেট
এবার যেন সত্যি খোলে
চা-বাগানের গেট!

সত্যি বাঁচুক্ লোক
শিক্ষা এবং স্বাস্থ্য নিয়ে
ব্যবসা বন্ধ হোক!

ফুস্-মন্তর ফুস্
নতুন বছর আর যেন কেউ
খায় না কোথাও ঘুষ!

ছন্দে অমিত কুমার দে

ছবিতে অমিতেশ চন্দ

এখন ডুয়ার্স পত্রিকায় প্রকাশিত বিজ্ঞাপনের বিষয়বস্তুর দায়িত্ব পত্রিকা কর্তৃপক্ষের নয়। যে কোনও প্রকার আইনি ব্যবস্থা কলকাতা এলাকার মধ্যে হতে হবে।

এই সংখ্যায় বেশ কিছু ছবি বিভিন্ন ওয়েবসাইট থেকে নেওয়া হয়েছে। তাদের কাছে আমরা কৃতজ্ঞ।

তৃতীয় বর্ষ, ১/২ সংখ্যা, ১৫-৩০ এপ্রিল ২০১৬

এই সংখ্যায়

সম্পাদকের ডুয়ার্স ৪
নববর্ষ স্পেশাল ৬
নির্বাচনের ডুয়ার্স ৮
নির্বাচনী স্পেশাল ১১
প্রতিবেশীর ডুয়ার্স ১২

দূরবিন

পাহাড়ি ঢালে হড়কে যাবেন না তো হরকাবাহাদুর? ১৮
‘তৃণমূল প্রার্থী হয়ে ভোটে দাঁড়ালে হেরে ভূত হতাম’ ১৯

এখন ডুয়ার্স এক্সক্লুসিভ

পাহাড়ে পরিবর্তনের হাওয়া! ২০
অপরাজেয় অশোক! ২৪
‘জোট ক্ষমতায় আসবে আমি ১০০ শতাংশ আত্মবিশ্বাসী’ ২৫
তরাইয়ে কংগ্রেসি ক্ষীরের মালপোয়ার দিকে তাকিয়ে দু’পক্ষই ২৬

নিয়মিত বিভাগ

খুচরো ডুয়ার্স ১৫
পর্যটনের ডুয়ার্স ২৮
বইপত্রের ডুয়ার্স ৩৯
ভাঙা আয়নায় টুকরো ডুয়ার্স ৪০

ধারাবাহিক ডুয়ার্স

ছিটমহলের ছেঁড়া-কথা ৩৩
তরাই উৎরাই ৩৫
ডুয়ার্স থেকে দিল্লি ৩৭
লাল চন্দন নীল ছবি ৪১

শ্রীমতী ডুয়ার্স

সমাজে শ্রীমতী ৪৪
ডুয়ার্সের ডিশ ৪৫
শখের বাগান ৪৫
সাজগোজ, ভাবনা বাগান ৪৬
মেঘপিয়োন, টেক টক, ডাক্তারের ডুয়ার্স ৪৭

সম্পাদক প্রদোষ রঞ্জন সাহা ও অমিত কুমার দে
কার্যনির্বাহী সম্পাদক তপন মল্লিক চৌধুরী
ডুয়ার্সের ব্যুরো প্রধান শুভ্র চট্টোপাধ্যায়
শ্রীমতী ডুয়ার্স পরিচালনা শ্বেতা সরখেল
প্রধান চিত্রগ্রাহক অমিতেশ চন্দ
অলংকরণ দেবাশিস রায়চৌধুরী
সার্কুলেশন দেবজ্যোতি কর, দিলীপ বড়ুয়া
বিজ্ঞাপন সেলস সুরজিৎ সাহা
ইমেল- ekhonduars@yahoo.com
মুদ্রণ অ্যালবাট্রস, **প্রকাশনা** প্রদোষ রঞ্জন সাহা

ডুয়ার্সে ব্যুরো অফিস
মুক্তা ভবনের দোতলায়। মার্চেন্ট রোড। জলপাইগুড়ি

ডুয়ার্সের কফি হাউস এখন জলপাইগুড়িতে

লাগাতার আড্ডা

কবিতা বা স্ক্রিপ্ট পাঠ/বৈঠক

টিভিতে ম্যাচ দেখা

সাতটি দৈনিক পত্রিকা

ওয়াই ফাই পরিষেবা

এবং গরম চায়ের মৌতাত

আর কী চাই?

বেলা ১১টা থেকে রাত ৯টা পর্যন্ত খোলা
রবিবার বা অন্য ছুটির দিনেও স্বাগত জানাই

আড্ডাঘর

মুক্তা ভবনের দোতলায়, মার্চেন্ট রোড। জলপাইগুড়ি

বাড়িতে বসে ‘এখন ডুয়ার্স’ পেতে চান?

এখন ডুয়ার্স-এর পাঠকমহলে সাড়া ও চাহিদা দুই-ই বাড়ছে হু হু করে। এপ্রিল ১, ২০১৬ সংখ্যা থেকে জলপাইগুড়ির সঙ্গে কোচবিহার, আলিপুরদুয়ার, ফালাকাটা ও শিলিগুড়ি শহরে বাড়িতে বা অফিসে নিয়মিত ‘এখন ডুয়ার্স’ পৌঁছে দেওয়ার ব্যবস্থা হয়েছে। ভবিষ্যতে আরও অন্যান্য এলাকাতেও শুরু হবে এই ব্যবস্থা।

যাঁরা ‘এখন ডুয়ার্স’ নিয়মিত পেতে চান তাঁরা আজই ফোন করে নিজের নাম, ঠিকানা, ফোন নং লিপিবদ্ধ করান। পত্রিকা পৌঁছবে সঠিক সময়ে। পত্রিকার দাম পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে এজেন্টের হাতে তুলে দিতে হবে। নতুবা এককালীন বার্ষিক গ্রাহক হয়ে তাৎক্ষণিক দাম দেওয়ার ঝামেলা বিদেয় করতে পারেন। সেক্ষেত্রে ২৫০ টাকার বিনিময়ে বার্ষিক গ্রাহক হলে আপনি পাবেন ২৪টি সংখ্যার কুপন। পত্রিকা দিতে আসবেন যিনি তার হাতে কুপনটি ধরিয়ে দিলেই হবে।

আজই আপনার নাম, ঠিকানা গ্রাহক হিসেবে লিখিয়ে রাখুন। ফোন করুন ৯৮৩০৪১০৮০৮ নম্বরে।

ডুয়ার্স থেকে দিল্লি
চায়ের কাপে চোখের জল
ডুয়ার্সের ডিশ
ভাঙা আয়নায় টুকরো ডুয়ার্স
শ্রীমতী ডুয়ার্স
লাল চন্দন নীল ছবি

গুরুত্বের উত্তর কি আপনি জেনেছেন?

ইভিএম খোলার পর কী বেরুবে তা ভোটেশ্বর জানেন, কিন্তু এবারের ভোটে 'লড়াই' শব্দটার সদম্ভ উপস্থিতি কিন্তু উত্তরবঙ্গেই। এমনিতে ডুয়ার্সের ভোটের হাওয়া বলতে কিস্যু নেই। মিছিল-মিটিং হচ্ছে, কিন্তু ওইটুকুই। রাজনীতি উপলক্ষে 'চলো পেটাই, কিছু করে দেখাই' ব্যাপারটা উত্তরবঙ্গে অনেক কম। ডুয়ার্সে তো প্রায় নেই বললেই চলে। ফলে মিডিয়াকে দক্ষিণের 'মার মার কাট কাট' ভোটযুদ্ধে ব্যস্ত রেখে শান্তিতে, উৎসবের আবহাওয়ায় ভোট দিয়ে চলে আসবেন এখানকার নির্বাচকরা। হাওয়া ওঠার আগেই শেষ করে দেবে ঝড়। এই চুপচাপ, নিরুদ্‌বিগ্ন ভোটটাই লড়াইয়ের জবরদস্ত ইঙ্গিত।

ফলে শাসকদলও চাপে।

এটা সবাই না মানলেও জানেন যে, কং-বাম জোট আসলে 'শিলিগুড়ি মডেল'-এর রাজ্যব্যাপী চেহারা। কিন্তু ডুয়ার্স কিংবা উত্তরবঙ্গকে গুরুত্ব দেওয়ার প্রশ্নে সব দলের রাজ্য নেতৃত্ব একজোট। ফলে অশোক ভট্টাচার্যর বদলে সূর্যকান্ত মিশ্রকে জোটের মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে তুলে ধরা হচ্ছে। জোট জিতলে অশোকবাবু বড় জোর আবার উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন মন্ত্রী। গৌতম দেব এবং সৌরভ চক্রবর্তী জিতলে মাঝারি একটা মন্ত্রী বাড়বে উত্তরবঙ্গ থেকে।

দেবপ্রসাদ রায়কে প্রদেশ কংগ্রেসের সভাপতি হিসেবে ভাবা হয়নি আর অশোক ভট্টাচার্যকে মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে ভাবা যাবে না— এই দুই ভাবনার মূলসূত্রটা কিন্তু অভিন্ন। 'উত্তর'কে গুরুত্ব দেওয়া যাবে না। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ঘন ঘন ডুয়ার্স সফর করবেন ঠিকই, কিন্তু ডুয়ার্সে তাঁর ভাইদের রাজনীতি করতে হবে দক্ষিণী পর্যবেক্ষকদের নজরদারিতে। উত্তরবঙ্গের কংগ্রেসিরা নিজেদের কৃতিত্বে অস্তিত্ব বজায় রেখেও এলেও একই গল্প।

কিন্তু এ নিয়ে ভাবিত নয় উত্তরবঙ্গ। এটাই নিয়ম। ইংল্যান্ড যেমন ভারতকে, দিল্লি যেমন কলকাতাকে, নগর যেমন গ্রামকে... দক্ষিণবঙ্গ তেমনই উত্তরবঙ্গকে। তবে সবই পরিবর্তনশীল। ফলে, রাজ্য-রাজনীতিতে উত্তরবঙ্গকে কিঞ্চিৎ অনিচ্ছাসত্ত্বেও গুরুত্ব দেওয়ার ব্যাপারটা মেনে নিতে শুরু করেছেন কলকাতার হেড অফিসগুলি। অনুব্রত মণ্ডল, লক্ষ্মণ শেঠ, রেজ্জাক মোল্লার মতো নেতা উত্তরবঙ্গে গজায় না। সারদা-নারদার কারণে জনপ্রিয় হয়ে ওঠার তালিকাতেও এই বঙ্গ ডাহা ফেল। ভোটের কালে মার মার কাট কাট রবে ময়দানে নেমে পড়াতেও এদিককার রাজনীতিবিদদের আগ্রহ প্রায় শূন্য। খনি-শিল্প-সেলেব্রিটি-সিন্ডিকেটহীন উত্তরবঙ্গের রাজনীতির ক্ষেত্রটি এক কথায় নিরামিষ। ফলে মিডিয়ার ঠেকা পড়েছে গুরুত্ব দিতে। পার্টি ফান্ডকে কড়ি জোগাতে না পারলে পার্টির প্রদেশ আপিসে তুমি কোথাকার কে? আর নর্থ বেঙ্গলে 'সিট'ই বা ক'টা? কথাগুলো অক্ষরে অক্ষরে সত্যি! কিন্তু ওসব ছাড়াও যে রাজনীতি করা যায়, সেটাও সত্যি। যদি গুরুত্ব দিতে, তবে বুঝতে যে, গোটা রাজ্যে এভাবেই রাজনীতি করাটা উচিত ছিল সকলের। তবে কথায় বলে, 'বেটার লেট দ্যান নেভার'। এদ্দিন গুরুত্ব দাওনি, ভুল করেছ। এবার দিচ্ছ দেখে আনন্দ পাচ্ছি। কারণ আমরাও রাজ্যবাসী।

উত্তর-দক্ষিণের আর্থ-সামাজিক-রাজনৈতিক জীবনে ফারাক আছে। এই ফারাক আসলে বাঙালির বৈচিত্রের অঙ্গ। বৈচিত্রকে সর্বদা বজায় রাখতে হয়। স্টিমরোলার চালিয়ে সব কিছু ফ্ল্যাট করে দেওয়াটা মূর্খতার লক্ষণ। ফলত, দক্ষিণবঙ্গ থেকে পর্যবেক্ষক পাঠিয়ে উত্তরের রাজনীতিকে 'গাইড' করার যে পণ্ডশ্রম রাজ্যের প্রতিটি দল করে আসছেন, উত্তরকে গুরুত্ব না দিতে চাইলে প্রথমেই সেটা বন্ধ করতে হবে। প্রতিটি দলের উচিত উত্তরবঙ্গের জন্য আলাদা সভাপতি নিয়োগ করা। উত্তরবঙ্গকে আলাদা 'পলিটিক্যাল স্টেট' হিসেবে ভাবতে হবে।

ডানপন্থী দলগুলি চাইলেই এটা শুরু করে দিতে পারেন। কিন্তু বামপন্থীদের পলিটব্যুরো থেকে পাশ করিয়ে আনতে কত বছর লাগবে, সেটা একটা যথার্থ জিজ্ঞাসা।

কিন্তু আলিমুদ্দিন স্ট্রিট একবার ভেবে দেখুক যে, চা বলয়ে সিপিএম-দাদার ভায়েরা যে বিচক্ষণতা এবং নৈপুণ্যের সঙ্গে কমিউনিস্টগিরি করে এসেছিলেন, তার কতটুকু মর্যাদা আপনারা

ভোট ভোট

খুটখুট খটখট চটপট গটগট
ঝুটমুট ঝটপট ছটফট জোটজট
ভীমভুত কিমভুত ঢপভুত অদ্ভুত
খুঁতখুঁত কুতকুত সবভুত সৎভুত
চুপচুপ ছুপছুপ ধুপধাপ দুদ্দাড়
ঠিকঠিক থিকথিক টিপছাপ জোরদার
খিকখিক খ্যাকখ্যাক ফিসফিস মন্তর
পিঁকপিঁক প্যাঁকপ্যাঁক বিপবিপ যন্তর
ধুকপুক সব বুক ঢিবঢিব করে রে
তাকতাক ধিনধিন হিপহিপ হুররে।

ছন্দা মিত্র

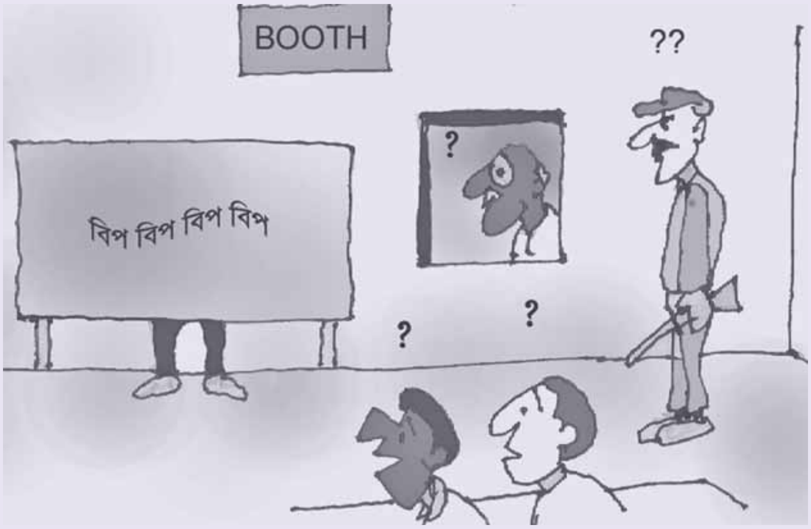

দিয়েছেন? ভোট পেরুলে সবার আগে এদিকে বাম-শরিকদের প্রাপ্য মর্যাদা দেওয়ার মিটিং ডাকুন। গুরুত্ব দিতে শুরু করুন। নইলে আগামীতে বুর্জোয়ারা আপনাদের দাঁড় করিয়ে গোল দেবে।

কিন্তু গুরুত্ব পাওয়ারও বিপদ আছে। উত্তরবঙ্গ বলতে প্রদেশ যদি শিলিগুড়ি ভেবে নেয়, তবেই কেলো। এখনও পর্যন্ত এই বঙ্গের, বিশেষ করে ডুয়ার্সের উন্নতি বললেই শিলিগুড়ির কথা তুলে বুঝিয়ে দেওয়া হয় যে, ক—ত্ত উন্নতি! রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর একবার বলেছিলেন যে, শরীরের গোটা রক্ত মুখে এসে জমা হলে তাকে সুস্বাস্থ্যের লক্ষণ বলা যায় না। তাই সব গুরুত্ব উত্তরের মুখ ভেবে শিলিগুড়িতে ডাম্প করে দিলে গোলমাল অক্ষুণ্ণ থাকবে। রাজ্য-রাজনীতিতে উত্তরবঙ্গের গুরুত্ব স্বীকার করে নিতে হলে কয়েকটি সূত্র অনুসরণ করতেই হবে। যথা—

ক) এক-দু'দিনের নোটিশে জেলা সভাপতি বা সেক্রেটারিদের কলকাতায় ডেকে পাঠাবেন না। পাঠালে প্রদেশ অফিস থেকে টিকিট কেটে পাঠিয়ে দেবেন। রিটার্ন টিকিট সমেত।

খ) কলকাতার সম্মেলনে জেলা থেকে লোক গেলে সমপরিমাণ লোক জেলার মিটিং-এ কলকাতা থেকে পাঠাতে হবে।

গ) কলকাতা থেকে পর্যবেক্ষক পাঠালে চিরকাল ভুল রিপোর্ট যাবে। এই করে গত নির্বাচনে বামেরা ডুবেছিল। ডুয়ার্সের নেতাদের রিপোর্টেই আস্থা রাখুন।

ঘ) দলে থেকে প্রতি দশ বছরে একবার উত্তরের নেতাকে মুখ্যমন্ত্রী এবং রাজ্য নেতৃত্বের প্রধান হিসেবে তুলে ধরা ও নির্বাচিত করা বাধ্যতামূলক করুন।

সূত্রগুলি পালন করা অসম্ভব মনে হচ্ছে? তাহলে আপনি এখনও আগামী দিনের রাজ্য-রাজনীতির ময়দানে উত্তরবঙ্গের গুরুত্ব কিস্যু বোঝেননি।

গুরুত্বটা কিন্তু বাস্তব। নির্ভয়ে ভোট দিন।

LIC
भारतीय जीवन बीमा निगम
LIFE INSURANCE CORPORATION OF INDIA

১২ বছরের বিশ্বস্ত নাম

Arajit Lahiri (Raja)
Zonal Manager Club Member for Agent

Contact for Free Consultancy & Servicing
- LICI Agent
- Housing Finance Ltd. Agent
- Mortgage Loan
- Premium Deposit
- NEFT Registration
- Nominee Changes
- All Type of Loan

শুভ নববর্ষের প্রীতি ও শুভেচ্ছা

9932103350, 9832452859
arajit45@gmail.com

WELCOME TO HERITAGE CITY COOCHBEHAR

HOTEL GREEN VIEW

Suit AC, Super Delux, AC,
Non AC, Conference Hall

HOTEL
Green View
Food & Lodging

Badurbagan Chowpathi, Coochbehar, Contact (03582) 224815/ 229081 (O), 9434756733 (M)

নববর্ষ স্পেশাল

১৪২৩ কেমন যেতে পারে রাজনীতির নেতা-কর্মীদের

রাজনীতি সম্পর্কিত জ্যোতিষশাস্ত্র ‘রাজ্যোতিষ নীতিকয়েকম্’ অনুসারে বঙ্গরাজনীতি চর্চাকারীদের রাজভাগ্য আলোচনা করা হচ্ছে। সনাতন জ্যোতিষশাস্ত্রগুলিতে যে ব্যক্তির যে রাশি, তা আজীবন অপরিবর্তিত থাকে। রাজ্যোতিষশাস্ত্র অনুসারে ব্যক্তির রাশি সদা পরিবর্তনযোগ্য। তবে একটি রাশির দশা একশো আশি সৌর দিবসের আগে ক্ষীণ হয় না। কর্মের দ্বারা কোনও কোনও প্রতিভাবান/বতী রাশি বদলানোর সময় সাত দিবসে নামিয়ে এনেছেন, এমন দৃষ্টান্ত অবশ্য বিরল নয়।

সাতশত তিরানব্বই আলোকবর্ষ পশ্চিমে কোষ্ঠিয়ান গ্রন্থে এই জ্যোতিষবিদ্যার প্রথম প্রচলন। খ্রিস্টপূর্ব তিন হাজার অব্দে কোষ্ঠিয়ানদের নিকট এই বিদ্যা আয়ত্ত করেছিলেন হরিঙ্কমুনি। তিনিই পৃথিবীতে এই বিদ্যার প্রচলন করেন বলে কিংবদন্তি। বর্তমানে এই বিদ্যার প্রচলন প্রায় লুপ্ত। আশা করি ‘এখন ডুয়ার্স’ পত্রের উদ্যোগে এই বিদ্যার পুনঃপ্রচলন ধরাধামে ঘটবে।

নিম্নে রাজ্যোতিষবিদ্যার দ্বাদশ রাশি অনুযায়ী রাজব্যক্তিদের ভাগ্য আলোচিত হল।

প্রেস রাশি: এই রাশির দশায় থাকা রাজব্যক্তিদের মিডিয়ার প্রতি টান থাকে। এই টান সময়বিশেষে ‘কু’ কিংবা ‘সু’ হয়। লগ্নপতি অষ্টমে এবং সপ্তমপতি ইউরেনাস দ্বারা গ্রস্ত হলে ব্যক্তি প্রেস দেখলেই ক্রুদ্ধ হবেন। অন্যথায় সংবাদমাধ্যমে তাঁকে সর্বদা দেখা যায়। আগামী শ্রাবণ মাস নাগাদ ধ্রুবতারার প্রভাব সক্রিয়তর হবে বলে উক্ত সময় থেকে প্রেস রাশিস্থিত ব্যক্তিদের মনোভাবনায় বিপরীতমুখী পরিবর্তন লক্ষিত হয়। তবে এই ধরনের পরিবর্তন ২৭ কার্তিক বারবেলার পর করা উচিত হবে না। ভিন্ন গ্যালাক্সির তারার প্রভাবে মাঝে মাঝে হতাশা আসবে। প্রতিকারের জন্য সপ্তাহে তিন দিন নিরামিষ ভোজন এবং সংবাদ চ্যানেলাদি দর্শন নিষিদ্ধ রাখতে হবে। ধারণীয় প্রস্তর— গ্রানাইট ছয় রতি। বিকল্পে মধুকুপি ঘাসের মূল। উচ্চারণীয় মন্ত্র ‘ওং হ্রীং ক্লীং প্রেস ফট্’। ১০৮ বার। পটি করার আগে।

ক্লিশ রাশি: বর্তমান বৎসর এই রাশির দশায় থাকা রাজব্যক্তিদের কাছে কিঞ্চিৎ চাপের। এই রাশির ছায়ায় আসামাত্র পঞ্চমপতি বুদ্ধিভাবের উপর বক্রদৃষ্টি আরোপ করে। বৈশাখের শেষ দিকে ক্লিশ রাশির ব্যক্তিদের ভাগ্যস্থানে একাধিক অপ নীহারিকার উপস্থিত লক্ষ করা যায়। মূলত রিয়্যালিটি ভুলে ভার্চুয়ালিটিতে মত্ত হওয়াটাই হবে মূল সমস্যা। ফলে যা ভাববেন, তার উলটো দেখবেন। তবে হতাশ হওয়ার কারণ নেই। চন্দ্রের প্রভাবে এঁরা বর্তমান বৎসরে রাজনীতি থেকে সাময়িকভাবে ছুটি নিতে সক্ষম হবেন। চন্দ্র তুঙ্গে থাকলে আর রাজনীতিতে ফিরবেন না। ক্লিশ দশা থেকে দ্রুত উত্তরণের জন্য অবশ্য মোক্ষম প্রতিকার রাজ্যোতিষে পাওয়া যায়। জাতকরা বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠে অ্যান্টিমনির অঙ্গুরি ধারণ করলে এবং ‘গচ্ছতি পতাকাং চ নীতি ক্লীং ফট্’ দিনে হাজারবার জপ করলে আশাতীত ফললাভের সম্ভাবনা। যাঁদের ভাগ্যে বুধ-নেপচুন যোগ আছে, তাঁরা প্রতিকারে জীবন বদলে ফেলতেও সক্ষম।

জিতুন রাশি: এই রাশিতে যাঁহারা বর্তমান বৎসরে প্রবেশ করবেন, তাঁদের রাজভাগ্য লক্ষিত হয়। নির্বাচনের বৎসরে এই রাশির নবমপতি হ্যালির ধূমকেতু দ্বারা দৃষ্ট হওয়ার কারণে রাশির তেজ কয়েক গুণ বর্ধিত হয়ে থাকে। ফলে ১৪২৩ বঙ্গাব্দে এই রাশির ব্যক্তিগণ যেনতেন প্রকারে জয়ী হবেন— এটাই স্বাভাবিক। ভাগ্যস্থানে সপ্তর্ষিমণ্ডলের দৃষ্টিহেতু এঁদের জন্য একজন ব্যক্তি শত শত ভোট দিতে সক্ষম হয়। জয়লাভের নিমিত্তে যাবতীয় কৌশল এঁরা এই বৎসর সাফল্যের সঙ্গে ঘটাবেন বলেই অনুমান। কোনও কোনও ব্যক্তির বুদ্ধিস্থানে শনির বলয়ের হাওয়া লাগে বলে তাঁরা বিপরীত ফলও পেতে পারেন। সে ক্ষেত্রে নবধাতুনির্মিত ‘নির্বাচনীয় কবচ’ নীল সুতোয় বেঁধে গলায় ধারণ আবশ্যক। বাহিনী ও কমিশন জাতীয় শত্রুরা ক্ষতি করতে চাইলে ‘ভূতাবিষ্ট যজ্ঞ’ ভাল ফল দেবে। রাশিদশা দীর্ঘ করার জন্য প্রতিদিন ৭২ বার ‘বুলেটং ফ্লট স্বাহা’ জপ। স্ট্রিং থেকে বাঁচার জন্য বসার ঘরের প্রবেশ দরজার উপরে লোডেড পিস্তল রাখা জরুরি।

মর্কট রাশি: এই রাশির দুইটি দশা। প্রচ্ছন্ন এবং প্রকট। যে ব্যক্তিগণ গত বৎসর প্রচ্ছন্ন দশায় অজ্ঞাতসারে প্রবেশ করেছেন, তাঁরা বর্তমান বৎসরে দ্বিতীয় মাসের গোড়াতেই এই রাশির প্রকট দশা অনুভব করে মর্কটের ন্যায় হেজে যাবেন। পয়লা জ্যৈষ্ঠ এই রাশির ব্যক্তিদের চেতনস্থানে শনি তাঁর বলয় এবং যাবতীয় উপগ্রহসহ রাহুকে সঙ্গে নিয়ে হানা দেবেন। এর ফলে এক পক্ষের মধ্যে লাল বাতি, সান্ত্রি, দপ্তর, এমনকি ধনসম্পদ অবধি নাশ হওয়ার বিকট সম্ভাবনা। যশস্থানে কালপুরুষের পদাঘাত হেতু আচরণে লুব্ধক দোষ দেখা যাবে। বর্তমান বৎসরে এই রাশির ব্যক্তিদের প্রতিকারের কোনও উপায় নাই। কিন্তু হতাশ হলে চলবে না। তেরো মাসের পর মর্কট রাশির দশা হালকা হতে শুরু করে। তাই আশ্বিন মাসের পর থেকে বালতিতে সাত ঘাটের জল মিশিয়ে দিনের প্রথম প্রহরের মধ্যে স্নান সম্পন্ন করতে হয়। ধারণীয় ধাতু- কোবাল্ট। শুভ রং- গেরুয়া। শুভ পশু- গাধা।

কিংহো রাশি: দ্বাদশ রাশির রাজা রূপে কিং হো রাশিকে গণ্য করা হয়। এই রাশির গোচরে যাঁরা বর্তমান বৎসরে থাকবেন, তাঁরাই হবেন রাজ্যের প্রকৃত কিং। এঁরা জিতবেন অথবা হারবেন না। কিন্তু সর্বদা জিতুন রাশির ব্যক্তিদের সঙ্গে মিলমিশ হওয়ার কারণে কেবল অঙ্গুলিহেলনের দ্বারাই আশ্চর্য ফল পাবেন। এঁদের লগ্নপতি বৃহস্পতি এবং তা গ্রহাণুপুঞ্জের বক্রী দৃষ্টি থেকে মুক্ত থাকায় চাইলে বিএ ফেল ব্যক্তিকে এঁরা মহাবিদ্যালয়ের প্রধান করে ফেলতে পারবেন। ‘আরক্ষাকবচ’ ধারণ করলে পুলিশের চক্ষে সহজেই অদৃশ্য থাকা সম্ভব হবে। মঙ্গলের দু’টি উপগ্রহের দৃষ্টি এঁদের উন্নতিস্থানে পূর্ণরূপে থাকায় সুইস ব্যাঙ্কে অ্যাকাউন্ট অসম্ভব নয়। তবে ‘সিবিআই দোষ’ থাকায় অনামিকায় বারো রতি ডলোমাইট, বিকল্পে কোমরে গঞ্জিকামূল ধারণ কর্তব্য। যা করার, প্রথম ছয় মাসের মধ্যে করার চেষ্টা করুন।

সন্না রাশি: সন্না বা ফরসেপ-এর ন্যায় এই রাশির দশায় আসা ব্যক্তিগণ বৎসরে দুইটি বিপরীতমুখী রাজনীতি দ্বারা নিজেদের মনন চেপে রাখতে শুরু করেছিলেন, তা আমরা

জানি। বর্তমান বৎসরের শ্রাবণ মাসের শেষ সপ্তাহে এঁদের লগ্নের তৃতীয়, সপ্তম ও নবমে সৌর ঝঞ্ঝার প্রকোপ ক্ষীণ হতে থাকবে। ফলে তৃতীয় কোনও প্রতীক বা পতাকার প্রতি এঁরা আকর্ষণ বোধ করতে থাকবেন। রুপার তৈরি ‘পদ্ম মাদুলি’ ধারণে এই আকর্ষণ যে জীবনে সাফল্য বয়ে আনবে তা প্রায় নিশ্চিত। নবান্নের আগেই আকর্ষণ প্রবলতর হওয়ার যোগ বিদ্যমান। এই সময়ে ‘পাপশুদ্ধি’ করলে আশানুরূপ ফল মিলবে। তবে এই রাশির আওতায় থাকা ব্যক্তিদের ইউরেনাস দুর্বল থাকে বলে রাজনৈতিক সন্ন্যাসগ্রহণের আশঙ্কাও লক্ষিত হয়। তাই শয়ানকালে শিয়রে রামায়ণ রাখা কর্তব্য। অষ্টধাতুর ‘দেশপ্রেম কবচ’ ধারণে শান্তিলাভ।

ধুলা রাশি: বৎসরের গোড়াতে এই রাশির দশা ভোগকারী ব্যক্তিবর্গের লগ্নে শুক্রের পরিবর্তে কেতু প্রবেশ করবে। ফলে হার প্রায় নিশ্চিত। হারের পর প্রতিপত্তি ধুলায় মিশে যাবে বলেই রাশির এরূপ নামকরণ। ফলে বৎসরের প্রথম ভাগ এই রাশির দশাভুক্ত ব্যক্তিদের অতি অশুভ দৃষ্ট হয়। কিন্তু আষাঢ়ে পূর্ণিমার দিন সূর্যাস্ত পর্যন্ত উপবাসে থেকে লজ্জাদেবীর পূজা দিলে দেখা যাবে, ভাগ্যে পরিবর্তন সূচিত হচ্ছে। কিন্তু তাড়াহুড়োয় শুভযোগ যাতে হাতছাড়া না হয়, সে কারণে পরবর্তী দুই মাস কোনওভাবেই উত্তেজিত হওয়া বর্জনীয়। অগ্রহায়ণ পর্যন্ত আলফা সেন্টরির নক্ষত্রাবলি প্রতিকূল থাকায় কটূক্তি এবং কিঞ্চিৎ লাঞ্ছনা সহ্য করতে হবে। বর্তমান বৎসরে শেষ ভাগে ধুলা রাশির প্রভাব ক্ষীণ হওয়ার প্রবল সম্ভাবনা। গ্রহণীয় ধাতু- মধ্যমায় চুম্বকত্বপ্রাপ্ত লৌহ ব্যতীত আর কিছু নয়। শনি-মঙ্গলবার কবিতা লিখলে মন শান্ত থাকবে। স্মর্তব্য যে, রাজনৈতিক সাফল্যপ্রাপ্ত সকলকেই ধুলা রাশির দশা অতিক্রম করতে হয়েছে। ইলিশ মাছ খাবেন না।

মিশ্রিক রাশি: এই রাশির দশাপ্রাপ্তদের ক্ষেত্রে বর্তমান বৎসর বড়ই মিশ্র বলে পরিলক্ষিত হয়। কর্মস্থানে বৃহস্পতিবার উপগ্রহগুলি পরস্পর বিরোধী প্রভাব বজায় থাকার কারণে এঁদের ভাগ্য বিচিত্র গতিতে ওঠানামা করবে বলেই অনুমান। ফলে কখনও জেলা সভাপতির কৃপাদৃষ্টি হেতু উচ্চপদলাভ এবং কখনও গোষ্ঠীদ্বন্দ্বের কারণে বিদেশ সফরের তালিকা থেকে বাদ যাওয়ার মতো ঘটনা ঘটবে। অজানা ধূমকেতুর প্রভাবে লগ্নপতি বিচলিত থাকায় কখনও সাততারা হোটেল, কখনও সংশোধনাগারে দিন কাটতে পারে। সাধারণত এই রাশির দশাগ্রস্ত ব্যক্তিদের জন্য কোনও প্রতিকারের বিধান নেই। তবে স্তবস্তুতির মাধ্যমে গ্রহ-উপগ্রহ দোষ থেকে অনেকটা মুক্ত থাকা যায়। উপযুক্ত পাত্রে সুরা পরিবেশন করলে অনেক বিপদ থেকে রক্ষা পাবেন। বর্তমান বৎসরের অন্তে যে ‘শ্রী’যুক্ত পুরস্কারলাভের সম্ভাবনাও যথেষ্ট— এটা ভুলে গেলে চলবে না। পারলে প্রতিদিন কুকুরকে উৎকোচ দিন।

হনু রাশি: বিধাতার বিচিত্র খেয়ালের কারণে রাজব্যক্তিরা যখন হনু রাশির দশায় পা রাখেন, তখন তাঁদের লগ্নপতি বুধের উপর সুদূরবর্তী ব্ল্যাক হোলের ছায়া এসে পড়ে। ফলে সমগ্র দশায় তাঁরা ‘মুক কী হনু’ ভাবনায় চালিত হন। ভাদ্র মাস অবধি মৃত নক্ষত্রগুলি নিষ্ক্রিয় থাকার কারণে এঁরা সহজেই পুলিশের খাতায় নাম লেখাতে ব্যস্ত হয়ে পড়লেও পুলিশ সময়মতো খাতা খুঁজে পাবে না। কার্তিকের দ্বিতীয় সপ্তাহ পর্যন্ত এঁরা বোমা-বন্দুক ব্যবহারে শুভ গ্রহাবলির সাহায্য পাবেন। এর পর রাহু তুঙ্গ হতে শুরু করলে গুপ্তশত্রু দ্বারা আক্রান্ত হতে পারেন। এর প্রতিকারের জন্য প্রতি কৃষ্ণপক্ষের একাদশীতে থানাগৃহে হানা এবং কার্তিক মাসের শেষে ‘খাকিদমন যজ্ঞ’করণ আবশ্যক। বুলেটের খোলে ঘৃতকুমারীর মূল ভরে মাদুলিরূপে ধারণ করলে সরকারি উকিল স্নেহের চোখে দেখবে। দৈনিক ১০৮ বার ‘হ্রীং দুম ধাঁই ক্লীং’ মন্ত্র উচ্চারণে হনুত্বের পরিমাণ ও কাল দুইই বৃদ্ধি করা সম্ভব। মন্ত্রী দর্শনের শুভবার- রবি ও বুধ (দ্বিপ্রহরের পর)। ‘রাজতোলা’ যোগ থাকলে দৈনিক লাখ টাকা তোলা আদায়ের সম্ভাবনা।

বকর রাশি: বর্তমান বৎসরে এই রাশির দশায় আগত ব্যক্তিরা কেবল দূরদর্শনে বকর বকর করে সময় কাটাবেন। এঁদের যশস্থানে বৃহস্পতি পূর্ণ ভর দিয়ে উপস্থিত থাকে বলে রাস্তায় দেখলে পাবলিক গালি দেবে ঠিকই, কিন্তু সংবাদ চ্যানেল এঁদের প্রতি অত্যন্ত আকৃষ্ট থাকায় যশলাভ মন্দ হবে না। যেহেতু লগ্নাধিপতি নেপচুন প্রতিদিন এক ঘণ্টা জেগে থাকেন, তাই নিত্য ‘ঘণ্টাখানেক’ জাতীয় অনুষ্ঠানে এঁদের ডাক পড়বে। ‘উল্কাদৃষ্টি’ যোগ থাকায় কিছু দুধ-ভাত কমিটিতে এঁদের স্থান পাওয়ার সম্ভাবনাও উড়িয়ে দেওয়া যায় না। বর্তমান বৎসরে এঁদের কর্তব্য পোশাক ও রূপচর্চার প্রতি যত্নবান হওয়া। সোমবার পাউডার রাখা এবং শনিবার মেকআপম্যান থেকে সতর্ক থাকা আবশ্যক। পূর্ণিমা-অমাবস্যায় শীতাতপনিয়ন্ত্রিত স্টুডিয়ো বর্জনে ভাল ফল পাবেন। মাঘ মাস পর্যন্ত মিছিল-মিটিং এড়ানো কর্তব্য। ফাল্গুনের তৃতীয় সপ্তাহে লগ্নের সপ্তমে একযোগে প্লুটো এবং শুক্র প্রবেশ করবে। ওই সময় থেকে ডুয়ার্সের ছোট ছোট সভায় ভাষণ দেওয়া শুরু করতে পারেন। ধারণীয় ধাতু-পটাশিয়াম। ধারণীয় রত্ন-হীরক (বিকল্পে অঙ্গারভস্ম জলে মিশিয়ে নিত্য উষাকালে পান)।

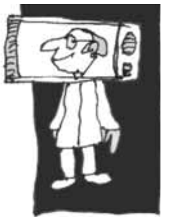

শুম্ভ রাশি: শুনতে খারাপ লাগলেও এই রাশির দশায় পড়ে বর্তমান বৎসরে অনেক কর্মী ও সমর্থক আত্মঘাতী কর্মে লিপ্ত হয়ে জীবনে অস্থিরতা ডেকে আনবেন। কর্মস্থানে রাহু আর কেতুর যুগলাবস্থানের কারণে গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব থেকে কিছুতেই নিস্তার পাবেন না। পুজোর আগে নিজ পার্টি আপিসে ঠেঙানি খাওয়ার প্রবল সম্ভাবনা দেখা যায়। শনি সারা বৎসর বিরূপ থাকায় প্রোমোটারি, ঠিকেদারি, সিন্ডিকেটের কর্মে মস্তকে দলীয় পতাকাচ্যুত যষ্টির আঘাত লাগাটা বিচিত্র নয়। একাধিকবার হাসপাতাল যোগ পরিলক্ষিত হচ্ছে। এই রাশির দশায় থাকাকালীন দলীয় নেতৃত্বের কাউকে পুরোপুরি বিশ্বাস করাটা উচিত হবে না। বুধ শুভ থাকায় বিপক্ষ দলের সঙ্গে যোগাযোগ রাখলে কিঞ্চিৎ মনের ভার হালকা করতে পারবেন। আবার, গ্রহাণুপুঞ্জের অবস্থান অনুকূল থাকায় আজ যে ঠেঙাবে, কাল সে স্কচপানের প্রস্তাবও দিতে পারে। কোনও অবস্থাতেই বিচলিত হবেন না। ‘শুম্ভ’ শব্দটি কিঞ্চিৎ এলোমেলো করলে ‘শুভম্’ শব্দ পাওয়া যায়। তাই শুভদিন আসবেই। সংবৎসর বাড়ির ঈশান কোণে দলীয় পতাকা উলটো করিয়া লাগিয়ে রাখলে ভাল ফল পাবেন।

জিন রাশি: দ্বাদশ রাশির শেষ হল জিন। কিন্তু ব্যক্তি তাঁর জীবনে একবারই জিন রাশির দশাগ্রস্ত হয়ে থাকেন এবং দশার কারণেই তাঁরা অকস্মাৎ রাজনীতির প্রতি প্রবল অনুরাগ অনুভব করেন। জিন-এর মধ্যে রাজনীতির রাসায়নিক প্রবেশ করে। সাধারণত কবি, শিল্পী, নাট্যকার, অভিনেতা, ক্রীড়াবিদরাই এই রাশির দশায় আসেন। আম ব্যক্তিরা এই রাশির আওতার বাইরে। বর্তমান বৎসরে জিন রাশিতে পদার্পণের বেশ কিছু চমকপ্রদ ঘটনা ঘটবে বলেই বিশ্বাস। এঁদের অধিকাংশের লগ্নের নবমে বিগ ব্যাং-এর প্রভাব থাকায় শাসকদলের দরজাতেই তাঁরা লাইন দেবেন বলে অনুমান। সে ক্ষেত্রে বছরের মাঝামাঝি ‘মিডিয়াতুষ্টি’ যজ্ঞ করা বিধেয়। তবে যাঁদের অষ্টমপতি দুর্বল, তাঁরা ভুল করে সত্যি কথা বলে কর্তার রোষানলে পড়ে বিরোধী দলেও যোগ দিতে পারেন। কোমরে কালো সুতোয় চা গাছের মূলধারণে এই সম্ভাবনা অনেকটাই কমবে। জনগণের মন আকর্ষণের জন্য সংবৎসর দুপুরবেলায় এক ঘণ্টা রোদ্দুরে হাঁটুন। বসার ঘরে এবং গাড়িতে গরিব মানুষের মুখ ঝুলিয়ে রাখলে শুভ হবে। রত্নধারণমাত্র অশুভ। দীপাবলি পর্যন্ত রোজ ১০০১ বার ‘হ্রীং সরকার ক্লীং গম্মেন্ট’ মন্ত্র উচ্চারণে মোক্ষম ফল।

গ্রহরাজ নীতিবাগীশ

ডুয়ার্সের আট ঘাট

এক

ডুয়ার্সে পৌঁছবার ট্রেন এখন গড়ে রোজ এক ডজন। ভোর সাড়ে ছ'টা থেকে রাত সওয়া এগারোটা পর্যন্ত। ওয়েটিং লিস্টের বহর তবু কমে না। নিরুপায় হয়ে তৎকালের দ্বারস্থ হতে হয়, কিন্তু ভাগ্যে শিকে ছেঁড়ে ক'জনের? সবক'টি ট্রেন ঠাসা, জেনারেল কম্পার্টমেন্টের ভিড় দেখলে ভিরমি খাওয়ার যোগাড়। ফেরার পথের অবস্থা আরও করুণ। টানা চার দিন তৎকাল চেষ্টা করে যখন ট্রাভেল এজেন্টও হাত তুলে দিচ্ছে তখন বাসযাত্রা ছাড়া উপায় নেই। আকাশপথের ভাড়াও এখন আকাশ ভেদ করে রকেটের মতো ধরাছোঁয়ার বাইরে। পরিচিত কলকাতার দুই মাঝারি ব্যবসায়ীকে মাথা পিছু ষোল হাজার দন্ড দিয়ে কলকাতা ফিরতে হয়েছে সে বিলাপও ফোনে শুনলাম। গ্রীষ্মের বা পুজোর কিংবা বড়দিনের ছুটিতে এমনটি হয়, কিন্তু এসময় রিজার্ভেশন টিকিটের এমন আকাল কেন, সে প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে যথেষ্ট নাকাল হতে হল। অবশেষে জানা গেল, ভোটপুজোই এর প্রধান কারণ। ডুয়ার্সে এখন ছোট বড় মাঝারি নানা মাপের সরকারি পদস্থদের ভিড়। ভিড় জমাচ্ছেন আলোকচিত্রী-সাংবাদিকের দল। রাজনৈতিক হোমরাচোমড়ারাও কম যাচ্ছেন না। পার্শ্ববর্তী আসামের ভোটও এর সঙ্গে যোগ হয়েছে। আশার ভবিষ্যৎবাণী করতে শুনলাম ডুয়ার্সের এক বড় মাপের পর্যটন ব্যবসায়ীকে— এই ভিড় যদি বছরে আরও বার দুয়েক হয় তো কথাই নেই, পর্যটন না হলেও ডালখোলা থেকে মোরগ্রাম ফোর লেনের কাজ সম্পূর্ণ হয়ে গেলে সড়ক পরিবহনে বিপ্লব আসতে বাধ্য। রেলের যাত্রীরা টিকিট না পেলে শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত এসইউভি গাড়ি ভাড়া করে আট-দশ ঘণ্টায় পাড়ি দিতে পারবেন এই পথ, খরচ পড়বে একই। আর পরিবহণের উন্নতি হলেই ডুয়ার্সের পর্যটন তো আর পিছিয়ে থাকবে না!

দুই

আলিপুরদুয়ারকে পৃথক জেলা হিসেবে স্বীকৃতি দিয়ে জেলার মানুষের প্রাথমিক আশীর্বাদটুকু নিজের ব্যাগে ঢুকিয়ে ফেলেছেন মমতা— এরকমটাই শোনা যায়। বাস্তবে দেখা যাচ্ছে জেলা হওয়ার যাবতীয় কৃতিত্ব ভোটের বাক্সে ঢুকিয়ে ফেলতে পারার সম্ভাবনা যেটুকু রয়েছে তা কেবলমাত্র আলিপুরদুয়ার সদর বিধানসভা কেন্দ্রেই। জেলার আর বাকি চারটি বিধানসভার মানুষ এ নিয়ে আদৌ ভাবছে না। কাজেই নতুন জেলার যাবতীয় আবেগ শুষে নিয়েছেন একাই সৌরভ চক্রবর্তী। যার ফলে তাঁর কেন্দ্রে যতটা নতুন জেলার সেন্টিমেন্ট কাজ করছে, জেলার অন্য প্রান্তে তার ছিটেফোটাও নজরে পড়ছে না। ফালাকাটা, বীরপাড়া, মাদারিহাট কোথাও না। পঞ্চাশ বছরের দাবিকে মান্যতা দিয়েছেন যে মমতা, তাঁর কৃতিত্বের সিংহভাগ উপভোগ করছে আলিপুরদুয়ারের তৃণমূল। কুমারগ্রাম, কালচিনি আর মাদারিহাটে মানুষের সঙ্গে কথা বলে পৃথক জেলা হওয়ার জন্য আলাদা করে কোনও অনুভূতির সন্ধান মেলেনি তাদের মধ্যে। স্বভাবতই বলা যায় একা সৌরভ রক্ষা করছেন দূর্গ। তাঁর জয় মানেই আলিপুরদুয়ারের মানুষ সেই নতুন জেলার আবেগে সহমত পোষণ করছেন। কিন্তু তাঁর পরাজয় মানে কি তবে মমতার উদ্যোগ বিফলে গেল? সেই দিকেই তাকিয়ে সবাই।

তিন

হঠাৎই সংবাদ মাধ্যমের নির্বাচন-বিশেষজ্ঞদের ত্রিনয়ন খুলেছে। অথচ 'এখন ডুয়ার্স'-এ গোড়া থেকেই অনুমান করা হচ্ছিল হাওয়া না থাকলেও বিজেপি ভোট এবার ডুয়ার্সে কমবে না, বাড়লে অবাক হওয়ার কিছু নেই। এর পেছনে যে যুক্তি কাজ করছে তা অতি সরল। ২০১৪ সালের মোদি হাওয়া হয়ত নেই কিন্তু শাসকদলের যে ভোটটুকু এবার কমবে বলে ধরা হচ্ছে তা বাম-কং জোটের চাইতেও বেশি যাবে বিজেপির বাক্সেই। শাসকদলের সংখ্যালঘু তোষণ নীতিতে আগাগোড়াই বিরক্ত সীমান্তবর্তী জেলাগুলির হিন্দু ভোটদাতারা এর আগেও নিঃশব্দে ভোটবাক্সে পদ্মফুলে আস্থা জানিয়েছে। এবার তার সঙ্গে যোগ হবে তৃণমূল বিরোধী ভোট যা জোটের বাক্সে ঢুকবে না। কিন্তু এসব ছাড়াও জলপাইগুড়ি ও আলিপুরদুয়ার জেলার আদিবাসী ও চা বলয়ে বিজেপির সংগঠন ক্রমেই শক্তিশালী হচ্ছে, সেই সঙ্গে বাড়ছে ভোটও। এই মুহূর্তে যা পরিস্থিতি, মাদারিহাট ও কালচিনিতে যেমন বিজেপি নিজেই আসন দখলের সম্ভাবনা দেখছে, তেমনই নাগরাকাটা, আলিপুরদুয়ার, ধূপগুড়ি ও রাজগঞ্জ বিধানসভায় বিজেপি-র ভোটই নির্ধারণকারী শক্তি হয়ে দাঁড়াচ্ছে বলে বোধ হচ্ছে।

চার

একেই বলে জঙ্গল মে মঙ্গল। ভোট ঘোষণা হতে না হতেই 'ত্রাহি ত্রাহি' রব পড়ে গেল কলকাতার পর্যটক মহলে। এরপর ভোটের বাজার গরম হয়ে গেলে বের হওয়া যাবে না, কোথায় কখন কী অঘটন ঘটে যাবে, এরপর রেজাল্ট বের হয়ে সব স্বাভাবিক হতে হতে গরমের ছুটি অর্ধেক পেরিয়ে যাবে ইত্যাদি আশঙ্কায় উত্তরমুখী পর্যটকরা ঝাঁপিয়ে

॥৩॥ নববর্ষের প্রীতি ও শুভেচ্ছা ॥৩॥
সঞ্জয় আচার্য, আইনজীবী, জলপাইগুড়ি জেলা আদালত
9434152137 • sanjoy.acharjee001@yahoo.in

শেষপর্যন্ত ডুয়ার্সের এক ডজন আসনের ক'টা জুটছে শাসকদলের? খুব কম হলে পাঁচ আর খুব বেশি হলে নয়। এমনটাই উত্তর দিলেন ডুয়ার্স তৃণমূলের জনৈক দায়িত্বশীল নেতা। তাঁর বক্তব্য, জোট যত জোরদার হবে আখেরে ততই লাভ হবে তৃণমূলের। কারণ ততই নাকি কোন্দল ছেড়ে ঐক্যবদ্ধ হবে তারা।

পড়েছিল দোল-গুডফ্রাইডের লম্বা ছুটিতে। এমন ভিড় পুজো বা গরমের ছুটিতেও দেখা যায় না, মন্তব্য করছিলেন নিউজলপাইগুড়ি স্টেশনের ভাড়া গাড়ির ড্রাইভাররা। ক'টা দিন টানা ভিড় ছিল পাহাড় তো বটেই, ডুয়ার্সের ছোট বড় রিসর্টগুলিতেও। দোলের দিন জঙ্গল বন্ধ থাকে, কিন্তু তাতে কোনও খামতি ছিল না অতিথির ভীড়ে। ক'টা দিন আবহাওয়াও ছিল যথেষ্ট মনোরম। অতিথিদের বায়নাক্কায় যেমন নাজেহাল হয়েছে রিসর্ট কর্মীরা, তেমনই জিপসি বোঝাই দর্শকের ভিড় ক'টা দিন জঙ্গলের শান্তিকে ভেঙেচুড়ে তছনছ করে দিয়েছে। ছুটি ফুরোতেই ফের ডুয়ার্সের পথঘাট টিকিট কাউন্টার ফাঁকা, ভোটের হাওয়া দখল নিয়েছে মানুষের দৈনন্দিন জীবনে। ক'টা দিন হাফ ছেড়ে বেঁচেছে জঙ্গলের গাছপালা, বন্যপ্রাণ, পোকামাকড়। জঙ্গলে এবার পড়ে পাওয়া চোদ্দো আনার মতোই লম্বা ছুটি।

পাঁচ

শাসকদলের অভিযোগ তো ছিলই, জোটের বাস্তব চিত্র দেখতে ডুয়ার্সের বারোটি কেন্দ্রেই চক্কর কাটতে হয়েছে গত চার-পাঁচ সপ্তাহে বার তিনেক। কারণ নির্বাচন বিশেষজ্ঞরা বলেছিলেন, জোটের রসায়ন গোড়াতেই পাওয়া মুশকিল। যত নির্বাচনের দিন এগিয়ে আসবে ততই নাকি জমে উঠবে বিরোধী শিবির, দেওয়াল ভরে উঠবে পোস্টার-ফেস্টুনে, হাওয়া গরম হয়ে উঠবে বক্তৃতায়, মিছিলে, ভোট দিন ভোট দিন আওয়াজে। নিন্দুকেরা বলেছিল, শিলিগুড়ি শহরের বাইরে ডুয়ার্সে গেলে জোটের গন্ধ পাওয়া মুশকিল। জলপাইগুড়িতে পাওয়া গেল জোটের জোরদার আওয়াজ। কিন্তু ফরওয়ার্ড ব্লক ও আরএসপি যে এই জোটে যথেষ্ট গোঁসা এবং নিজেদের বিশাল রাজনৈতিক ক্ষতির আশঙ্কা করছেন তার আভাসও মিলেছে ডুয়ার্সের সেই সব আসনে যেখানে সাংগঠনিক দিক থেকে তারা নিজেদের শক্তিশালী বলে মনে করছেন। যেমন জলপাইগুড়ি ও আলিপুরদুয়ার ও নাগরাকাটা আসনে যথেষ্ট সক্রিয় দেখা গেল না ফরওয়ার্ড ব্লক ও আরএসপি-কে। জনৈক প্রবীণ বাম শরিক নেতা স্পষ্টই জানালেন, মানুষের জোট বলে যা মিডিয়ার মাধ্যমে হাইলাইট করা হচ্ছে তার উপস্থিতি সর্বত্র নেই। কারণ তাঁদের মতে এমন অনেক জায়গাই আছে যেখানে কংগ্রেসের ভোট নেই বললেই চলে। ভোটের পর ফল আশানুরূপ না হলে তবু হয়ত রক্ষে কিন্তু জোটের ফল বেশি ভাল হলে অদূর ভবিষ্যতে বাম ঐক্যে ফাটল ধরাটা অস্বাভাবিক কিছু নয় বলেই স্বীকার করেছেন ডুয়ার্সের অন্তত হাফডজন বাম নেতা। কংগ্রেসিরা অবশ্য আগাগোড়া যেমন থাকে তেমনই নির্বিকার, যেখানে নিজেদের প্রার্থী নেই সেখানে বেশ একটা অভিনব মজার খেলা হিসেবে নিয়েছে তারা।

ছয়

বাজার এবার যথেষ্ট ভাল, অন্তত গতবারের তুলনায় তো বটেই। আলুর ফলন ভাল, চাষী ভাল দাম পেয়েছে, মহাজনকে ঋণ শোধ করেও ঘরে কিছু থাকবে পেট চালাবার জন্য। অন্যান্য সবজির ফলনও মন্দ হয়নি। ধূপগুড়ি, হলদিবাড়ি, শালকুমার ভোট পর্যটনে বেরিয়ে মাঠের চাষী থেকে শুরু করে পাইকারি ও খুচরো বিক্রেতা সবার সঙ্গেই টুকটাক কথা বলার সুযোগ মিলল। বসন্তের মিঠে বিকেলে আলের ধারে দাঁড়িয়ে থাকা চাষী পরিবারের 'বডি ল্যাঙ্গুয়েজ' নাকি তাই বলে! তবে কি 'অচ্ছে দিন' এসে গেল? তা নিয়ে সন্দেহ থাকলেও ভোটের মুখে মাঠের ভাল ফলন যে শাসকদলকে খানিক স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলতে দেয় তা বোধগম্য হয় ফালাকাটার এক তরুণ তুর্কী নেতার। ভোট করানোতে নাকি তার জুড়ি মেলা ভার। বাড়িতে একসময় সবাই লাল পার্টি করত, গ্রামে গ্রামে 'শান্তিপূর্ণ' ভোট করানোর কৌশল সেসময়ই কাকাদের কাছে রপ্ত করেছে। এখন জোড়াফুলের হয়ে ভোট করানোর আধুনিক প্রয়োগশৈলি তার নাকি বাঁ হাতের খেল। তার বক্তব্য, মন ভাল থাকলে গাঁয়ের মানুষকে জোরাজুরি করতে হয় না, ফলে ঝামেলাও কম হয়, নির্বিঘ্নে অপারেশন সাঙ্গ হয়।

সাত

আলিপুরদুয়ার-জলপাইগুড়ি বারোটি আসনের মধ্যে কোন কোন আসনে হাড্ডাহাড্ডি লড়াই হবে? বাম-কং বলতে চায়, সবক'টিতেই। তৃণমূলের বক্তব্য, কোনওটাতেই না, সব ক'টিতেই 'ক্লিন সুইপ'। তবু পথেঘাটে ঘুরে যা অনুমান করা যায়, জলপাইগুড়ি, আলিপুরদুয়ার, ধূপগুড়ি ও রাজগঞ্জে লড়াই যথেষ্ট জমবে আর চা বলয়ের চারটি আসনেও লড়াই থাকবে জোরদার। বিরোধীদের মতে, যত দিন এগিয়ে আসছে ভয়ের বাতাবরণ থেকে সাধারণ মানুষ তত বেরিয়ে আসার সাহস সঞ্চয় করছে, যা লড়াইয়ের ময়দান জমজমাট করার পক্ষে যথেষ্ট। তাহলে শেষপর্যন্ত ডুয়ার্সের এক ডজন আসনের ক'টা জুটছে শাসকদলের? খুব কম হলে পাঁচ আর খুব বেশি হলে নয়। এমনটাই উত্তর দিলেন ডুয়ার্স তৃণমূলের জনৈক দায়িত্বশীল নেতা। তাঁর বক্তব্য, জোট যত জোরদার হবে আখেরে ততই লাভ হবে তৃণমূলের। কারণ ততই নাকি কোন্দল ছেড়ে ঐক্যবদ্ধ হবে তারা। পঞ্চায়েত স্তরে তৃণমূল কর্মী নেতাদের নাকি এখন একটাই কথা বলা হচ্ছে, নিজেদের মধ্যে মারপিটি করছ করো, কিন্তু সেই সুযোগে জোট যদি তোমার গদি দখল করে তখন কিন্তু আবার ফিরে যেতে হবে সেই আগের দিনগুলিতে যখন নিজের বাড়িতে সসম্মানে বসবাস করাই ছিল কঠিন!

আট

এবার ভোটটা যে বড়ই লম্বা, কিছুতেই শেষ হতে চাইছে না, তাই না? টানা দু'মাসের অনুশাসনে বেশ নাজেহাল সাধারণ মানুষ। সরকারি দপ্তরগুলিতে অন্যান্য কাজকর্ম সব শিকেয় উঠেছে, কোনও কাজ করাবার উপায় নেই, কিছু খোঁজখবর বা জিজ্ঞেস করতে গেলেই উত্তর, ভোটটা যাক। স্কুল শিক্ষকদের পড়ানোয় মন নেই। কমনরুমে ম্রিয়মান খবরের কাগজ মাঝখানে রেখে চলছে জোরদার নির্বাচনী আলোচনা। আর খুদে পড়ুয়াদের তো আগাগোড়াই বড়দের মিছিল দেখতে বেশ লাগে। বিপদ ব্যবসায়ীদেরও। কেন্দ্রীয় বাহিনীর পথেঘাটে যেখানে সেখানে কড়া চেকিং, বেশি ক্যাশ টাকা সঙ্গে রাখার জো নেই। ভয়ে ক্যাশ কালেকশন টঙে উঠেছে, যথেষ্ট অসুবিধায় দিন কাটাচ্ছে ছোট মাঝারি ব্যবসায়ীরা। আর এবার যেন হাটেবাজারে চায়ের দোকানে ভোট নিয়ে কোনও তক্কাতক্কি বা বিশ্লেষণ নেই, সবাই কেমন চুপচাপ। এদিককার ভোটের খবর কী? জানতে চাইলে একটাই উত্তর ঘুরে ফিরে আসে, বলা খুব মুশকিল। ঘাসফুল কি এবার আদৌ জিততে পারবে? উত্তর আসে, কিছুই বলা যায় না। হাওয়াটা কি এবার একটু অন্যরকম? পালটা প্রশ্ন আসে, কী করে বলি বলুন তো? যে যেখানে পারছে কৌশলে এড়িয়ে যাচ্ছে আসল প্রশ্নটাই। এ কী ভয় নাকি বিরক্তি? নাকি উদাসীনতা? এবার কি পরিবর্তন হবে কিছু? এ প্রশ্নের উত্তর আগের মতো মেলে না কোথাও। ১৭ এপ্রিল মানুষের রায় যান্ত্রিক বাক্সে ঢোকার পর গচ্ছিত থাকছে আরও একমাস! ধৈর্য্য থাকবে তো কাকা এতদিন? স্বাধীনতার পর সবক'টি ভোট দেখার অভিজ্ঞতা নিয়ে উবু হয়ে বসে থাকা বৃদ্ধ ফোকলা দাঁতে হেসে বলে, আরে বাবা এত চিন্তার কী আছে, যে বেশি ভোট পাবে সে-ই তো জিতবে!

উত্তরায়ণ সমাজদার

ভোট বয়কটের আওয়াজ জারি উত্তরের নানা কোণে

সেতু না হলে নোটা

এবারের বর্ষাতেও নিদারুণ সমস্যায় পড়বেন বেশ কয়েক হাজার মানুষ। যেভাবে গত তিনটি বর্ষায় নাকাল হতে হয়েছিল। শুখা মরশুমেও কি হয়রানি কম? সুই নদীর পশ্চিম তীরে শিলিগুড়ি। জলপাইগুড়ি ও হলদিবাড়িসহ বহু এলাকায় বহু মানুষকে নানা কাজেই যেতে হয়। কিন্তু সেতু না থাকায় তাদের চলাচল নানাভাবে বিঘ্নিত। সাঁওতালপাড়া, কালীতলা, কবিরাজপাড়া, শিয়ালডাঙ্গি, দক্ষিণ ধরাপাড়া এবং পাহাড়িয়াপাড়ার বিস্তীর্ণ অঞ্চলের। কমপক্ষে দশ হাজার মানুষের বাস। কিন্তু তারা বিচ্ছিন্ন সুই নদীর কারণে। অন্য পাড়ে বিএসএফের দইখাতা, কুটিলা, শিবাজি বিওপি ছাড়াও রয়েছে বহু চা-বাগান। সুইয়ের পশ্চিম পাড়ের বিচ্ছিন্ন ভূখণ্ডের সঙ্গে দক্ষিণ বেরুবাড়ির মূল ভূখণ্ড সাতকুড়ার সঙ্গে যোগাযোগের একমাত্র ভরসা সুই নদীর উপর ১৯৯০ সালে নির্মিত সেতু। কিন্তু ২০১৩-য় ইট বোঝাই ট্রাক যাওয়ার সময় সেতুটি ভেঙে পড়ে। প্রশাসনের কোনও উদ্যোগ না দেখে স্থানীয় চা-বাগান মালিক ও গ্রাম পঞ্চায়েত যৌথ উদ্যোগ নিয়ে নদীর উপর একটি সাঁকো তৈরি করে। ওই সেতু দিয়েই সুই নদীর দুই পাড়ের লোক পারাপারের কাজ চালাচ্ছে। কিন্তু বর্ষায় হয় মহাবিপদ। তখন সাঁকো পেরনোর পদে পদে ঝুঁকি। স্থানীয় মানুষের এই সমস্যার কথা ভেবে উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন দপ্তরের উদ্যোগে দইখাতায় নতুন করে সেতু নির্মাণের কাজ শুরু হবে— রাজ্যে ভোট ঘোষণার আগেই শোনা গেল সেই কথা। সেতু নির্মাণ প্রকল্পের শিলান্যাসও সাত তাড়াতাড়ি সেরে ফেললেন জলপাইগুড়ির সাংসদ। কিন্তু তারপর মাসাধিককাল পেরিয়ে গেলেও ইটবালির দেখা মেলেনি। দীর্ঘদিন ধরে ওই সেতু নির্মাণের কাজ নিয়ে দক্ষিণ বেরুবাড়ি গ্রাম পঞ্চায়েতের দইখাতা গ্রামের মানুষ ক্ষোভ প্রকাশ করেছে, আবেদন-নিবেদনও কম করেনি। কিন্তু ভোটের আগে এখন তাদের ক্ষোভ বিক্ষোভে পরিণত হয়েছে। তারা স্পষ্ট করেই জানিয়ে দিয়েছে, ভোটের আগেই সেতু নির্মাণ না হলে তারা নোটা-য় ভোট দেবে।

কালভার্ট ভাঙা, তাই ভোট নয়

তিনটি এলাকার মধ্যে সংযোগকারী রাস্তা মাত্র একটি। আর সেই রাস্তাতেই রয়েছে একটি কালভার্ট। সেটিও ভেঙে পড়েছে গত পঞ্চায়েত নির্বাচনের আগে। আর ওই পথে প্রত্যেকদিন চলাচল করে প্রায় দশ হাজার স্থানীয় মানুষ। কিন্তু ভেঙে যাওয়া কালভার্ট নতুন করে নির্মাণ তো দূরের কথা, সংস্কারের কাজও আজ পর্যন্ত শুরু হয়নি। রাস্তাটি বন্ধ অবস্থায় পড়ে আছে। নাকাল হচ্ছে হাজার হাজার স্থানীয় মানুষ, অথচ হেলদোল নেই প্রশাসনের। আবেদন-নিবেদন নিয়ে মানুষ প্রশাসনের দরজায় হাজির হয়েছে বহুবার। কিন্তু কোনও ফল মেলেনি। হয়রানির শিকার হওয়া মানুষ জবাব দেওয়ার সুযোগ পেয়েছে ভোট দরজায় কড়া নাড়তেই। রাজনৈতিক দলের কর্মী-সমর্থক সঙ্গে নিয়ে প্রার্থী করজোড়ে হাজির হয়েছেন ভোট চাইতে। জলপাইগুড়ি শহর সংলগ্ন চেনপাড়া, গিদালপাড়া, তোড়লপাড়া এলাকার মানুষ কিন্তু মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে। সাফ কথা, তারা বুথমুখো হবে না।

রাস্তা নেই, জল নেই, ভোট নেই

গ্রামের কেউ অসুস্থ হলে তাকে চ্যাংদোলা করে স্বাস্থ্যকেন্দ্রে নিয়ে যেতে হয়। মোট কথা, বালুরঘাট এলাকার তপন ব্লকের আজমতপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের মালাপাড়া, গানহাপাড়া, কেয়াড়ি, মষকুটপু, কানিপুকুর, দয়ারা, ভুয়ারপাড়া প্রমুখ গ্রামগুলির পথঘাট দীর্ঘকাল ধরেই বেহাল। বর্ষায় যে অবস্থা হয় তা একমাত্র ভুক্তভোগী গ্রামবাসীরাই জানে। স্কুল, বাজার— সবকিছু ঘিরে হয়রানি। গ্রামবাসীরা উন্নয়নের ছিটেফোঁটা থেকে বঞ্চিত। বহু প্রতিশ্রুতি শুনে তারা বদল ঘটিয়েছিল। এখন তারা মর্মে মর্মে উপলব্ধি করছে যে, আসলে কোনও রদবদলই ঘটেনি। ভোট এসে পড়াতে রাজনৈতিক দলের কর্মী-সমর্থকদের ছোটাছুটি শুরু হয়েছে। মাঝেমধ্যেই হাজির হচ্ছেন বিভিন্ন দলের প্রার্থীরা। তাঁরা সবাই উন্নয়নের প্রতিশ্রুতি দিচ্ছেন। কিন্তু এবার আর সেসব কথায় মন ভোলানো যাবে না ওইসব গ্রামের হাজার হাজার মানুষের। তারা স্পষ্ট জানিয়ে দিয়েছে, আগে আজমতপুর থেকে দোয়ারা পাঁচ কিলোমিটার পাকা রাস্তা করে দেখাতে হবে। তা না হলে ছ'টি গ্রামের মানুষ বুথেই যাবে না।

অন্য দিকে তপন ব্লকেরই মালঞ্চ এলাকায় গরম পড়তেই পানীয় জল উধাও। পানীয় জল বলতে এই এলাকার ভরসা জুগিয়েছিল সজলধারা প্রকল্প। কিন্তু সেও শুরু হবার পর অকেজো হয়ে পড়েছে। গোটা এলাকায় দু'টি মাত্র হাতে চালানো নলকূপ, গরম পড়তে সে দু'টি দিয়েও জল পড়ে না। ফলে তীব্র জলসংকট। নিত্যপ্রয়োজনীয় কাজে পুকুরই একমাত্র ভরসা এলাকাবাসীর। প্রায় দুই কিলোমিটার দূরে গভীর সেচ পাম্প থেকে জল আনতে যেতে হয় মানুষকে। জলাভাবে এলাকার কৃষিকাজও প্রায় বন্ধ হবার জোগাড়। জলের স্তর গরমের শুরুতে নেমে গিয়েছে ৬০-৭০ ফুট নিচে। মালঞ্চ গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার পাতকোলা, পাহাড়পুর, সন্ধ্যাপুকুর, ডাংমালঞ্চ, অর্জুনপুর, অভিরামপুর, হরিবংশীপুর প্রভৃতি গ্রাম জুড়ে যে বিস্তীর্ণ এলাকা সেখানে চলছে জলের তীব্র সংকট। এ অঞ্চল আবার খরাপ্রবণ, ফলে আশঙ্কা দেখা দিয়েছে গ্রামবাসীর মনে। ওদিকে ভোট এসে পড়ায় দল-সমর্থক কর্মী নিয়ে প্রায় রোজই হাজির হচ্ছেন ভোটপ্রার্থীরা। কিন্তু জলের সংকটে নাজেহাল এলাকাবাসী ভোট বয়কটে সরব। প্রার্থীদের দেওয়া প্রতিশ্রুতি তারা কানে তুলছে না। কারণ, এসব কথা অনেক শুনেছে। এবার তারা হুমকির সুরেই ভোট না দেওয়ার কথা জানিয়ে দিয়েছে স্পষ্ট।

ডুয়ার্স ব্যুরো

ছবি: **কৌশিক বারুই**

ছন্নছাড়া রাজনীতির ঘোলা পাঁকে আম-রেশমের মালদা

‘যে জন আছে মাঝখানে’— হ্যাঁ, আম-রেশমের এই জেলাকে এমন নামে ডাকাই যায়। শুধুমাত্র পশ্চিমবঙ্গের মানচিত্রের মাঝামাঝি অবস্থানই নয়, রাজনৈতিক ম্যাপেও এ জেলা ট্র্যাডিশনাল সমীকরণের নিয়ম মানেনি বড় একটা। চৌত্রিশ বছরের বাম একাধিপত্যেও এখানকার সাংসদ ছিলেন কংগ্রেসের, তেমনই পরিবর্তনের ‘মমতা ম্যাজিক’ও যে খুব শিকড় ছড়িয়েছে জেলায়— এমন দাবি অতি বড় তৃণমূলিও করে না। বরং সেদিক থেকে মুখ্যমন্ত্রীর সাম্প্রতিক আর্তি, ‘এবারেও ফিরিয়ে দেবেন না তো?’— তাৎপর্যপূর্ণ।

বরিন্দ, টাল, দিয়ারা— এই তিন অংশে বিভক্ত জেলা প্রাকৃতিক ও আর্থ-সামাজিক বৈশিষ্ট্যেও বিভিন্ন। জেলার পূর্ব প্রান্তের হবিবপুর-বামনগোলা যখন তীব্র জলকষ্টে খরার মুখোমুখি, তখন পশ্চিম প্রান্তের কালিয়াচক-হরিশ্চন্দ্রপুর বন্যার আশঙ্কায় দিন কাটায়। তেভাগা বা পরবর্তী জমি আন্দোলন বরিন্দ অঞ্চলে বামপন্থী রাজনীতির বীজ পুঁতেছিল। সেই ফসল ঘরে তুলেছে হবিবপুর, গাজল বা বামনগোলায় । এমনকি গণিখান চৌধুরীর জয়যাত্রাতেও এই অঞ্চল মুখ ফেরায়নি । অবশ্য জেলার বাকি অংশে এই চরিত্র মেলেনি ভোটের বাজারে। বরং আমবাগান অধ্যুষিত জেলার দক্ষিণ-পশ্চিম অংশে ভূমিসংস্কারের সুফল না-পাওয়া মানুষের মনে সিপিএম দানা বাঁধতে পারেনি কোনও দিনই। সে কারণেই মানিকচক, কালিয়াচক, চাঁচল, সুজাপুর বা ইংরেজবাজার এই সে দিন পর্যন্ত কংগ্রেসের ভোট ব্যাঙ্ক হিসেবেই পরিচিতি পেয়ে এসেছে। গণিখান মারা গেছেন প্রায় দশ বছর, কিন্তু ট্র্যাডিশন ভাঙেনি।

আটবারের সাংসদ, প্রাক্তন রেল মন্ত্রী গণিখান চৌধুরীর রাজনৈতিক মৃত্যু হয়েছিল অনেক আগেই। বস্তুত, ১৯৮২ সালে ইন্দিরা গান্ধির অকস্মাৎ মৃত্যুই তাঁর প্রিয়পাত্র বরকতের উত্থান থামিয়ে দিয়েছিল হ্যাঁচকা টানে। রাজীব গান্ধির নেকনজরে তিনি কোনও দিনই ছিলেন না, ফলে ‘পরিকল্পনা রূপায়ণ’ জাতীয় খায় না মাথায় দেয় দপ্তর দিয়ে ‘কাজের লোক’-এর অবস্থা করুণ থেকে করুণতর হয়েছে। তবু ভোটবাজারে তাঁর কাটতি কমেনি। বরং অসুস্থতা এবং জনপ্রিয়তা, দুইই বেড়েছে সমান্তরালভাবে। বিধানসভা ভোটে বামপন্থীরা কিছু আসন পেলেও ‘বড় ভোট’ (অর্থাৎ লোকসভায়) বরকত ম্যাজিক কাজ করেছে একচেটিয়া।

‘জীবিত গণির চেয়ে মৃত গণি অনেক শক্তিশালী’— বিরোধীদের এমন হা-হুতাশ প্রায়ই শোনা যায় মালদা জেলায়। আক্ষরিক অর্থেই গণিখানের মৃত্যুর পর তাঁর ভাই, ভাগনি এখন সাংসদ। ভোটের সময় নিয়মমাফিক গণিবন্দনা এখন শুধু কংগ্রেস নয়, সব দলেরই দস্তুর। মুখ্যমন্ত্রীকেও প্রচারে এসে বলতে হয়, ‘বরকতদা এই জোট চাননি।’ সিপিএমের মিছিলও শুরু হয় গণির মাজারে ফুল চড়িয়ে। গণি ফ্যাক্টরকে অস্বীকার করার সাহস করে না কেউই।

পরিবর্তনের পরে মুর্শিদাবাদের মতোই কংগ্রেসের এই দুর্গেও নজর ছিল মুখ্যমন্ত্রীর। দু’জন বিধায়ক— দু’জনই মন্ত্রী। পরবর্তীতে রাজ্যের ট্র্যাডিশন মেনে বেশ কিছু বিধায়কের দল পরিবর্তন। এত কিছু করেও তৃণমূলের ভিত শক্ত হয়নি এ জেলায। বরং নিয়মমাফিক গোষ্ঠীদ্বন্দ্বের বিষবৃক্ষ ডালপালা ছড়িয়েছে । কৃষ্ণেন্দু, সাবিত্রী, মোয়াজ্জেম, বাবলা— কতগুলি যে গোষ্ঠী তৃণমূলের, তার হিসেব দেওয়া মুশকিল। জেলার মানুষ দেখে মঞ্চের উপরে দুই মন্ত্রীর ঝগড়া, অনুগামীদের মধ্যে সংঘর্ষ, সমাবেশ, পালটা জমায়েত— কে কতটা নিচে নামতে পারে, তার প্রতিযোগিতা। সহজবোধ্য কারণেই দু’টি পুরসভা আর কিছু পঞ্চায়েত দখল করা ছাড়া শাসকদলের মূল খুব গভীরে পৌঁছায়নি। ১২টি বিধানসভা আসনের প্রার্থী ঘোষণার পর চিত্রটা আরও করুণ। একদিকে প্রার্থীকে নিয়ে ক্ষোভ, অন্য দিকে প্রার্থীদের নিজেদের মধ্যে দূরত্ব— দু’টিই পাল্লা দিয়ে বেড়েছে। প্রতিটি বিধানসভাতেই কান পাতলে শোনা যাচ্ছে, এবারের ফল ১১-১। এটা যতটা ভবিষ্যদ্‌বাণী, তার চেয়েও বেশি ইচ্ছা— যেন আমি একাই জিতি, আর যেন কেউ...। জিতলেই মন্ত্রিত্বে অটোমেটিক চয়েস! তৃণমূল সুপ্রিমোর ঘন ঘন সফরেও এই দূরত্ব কাটার লক্ষণ নেই।

উন্নয়ন কিছুই হয়নি তা হয়ত নয়। কিন্তু এই পাঁচ বছরে যেটা হয়নি তা হল সংগঠন। আর সেই কারণেই উন্নয়নের ফসল তুলতে কালঘাম ফেলতে হচ্ছে শাসকদলকে। নইলে ১২টি বিধানসভার প্রার্থীর মধ্যে ৮ জনকেই নিয়ে যেতে হল শহর থেকে!

কিন্তু বিরোধী শিবিরও কি খুব ভাল অবস্থায়? ২০১১ উত্তর বামফ্রন্টের সংগঠন সারা রাজ্যের মতো এখানেও পাল্লা দিয়ে কমছে, তবু দক্ষিণবঙ্গের মতো শাসকের সর্বগ্রাসী রূপটা এখানে অনুপস্থিত বলেই হয়ত পঞ্চায়েত ভোটে সম্মানজনক একটা ফলাফল ছিল। এর পরে এল লোকসভায় মোদি-ঝড়। সীমান্তবর্তী এই জেলায় বহু আগেই মুসলিমরা অন্তত সংখ্যার দিক থেকে লঘুত্বের গণ্ডি পেরিয়েছে। বিজেপি-র একটা সমর্থক গোষ্ঠী তাদের উপস্থিতি জানান দেয় প্রতিটি ভোটেই। লোকসভা ভোটে তাই ঘর ভাঙল বামেদের।

আর আছে কংগ্রেস। সংগঠনে ভরসা না-করা মূলত ভাবাবেগ আর ব্যক্তিগত ক্যারিসমায় ভর করে এ জেলায় আছে এক ধরনের মোহাচ্ছন্নের মতো। হাজারটা উপদল আর কোতোয়ালি পরিবারের প্রতি আনুগত্য— দুটোই সমান সত্যি। সাংসদদের পাওয়া যায় না, এ যদি হয় বিরোধীদের অভিযোগ— এটা তাদের ইউএসপি-ও বটে। মসৃণ জোট কর্কশ হলে অন্তত দু’টি আসনে, প্রার্থী নির্বাচনে ক্ষোভ উঠে এল পরিধিতে— তারপরেও আত্মবিশ্বাসের একটা কারণ যদি হয় সিপিএম-এর বাধ্যতামূলক সঙ্গদান, অন্য কারণটা অবশ্যই শাসকদলের ছন্নছাড়া অবস্থান।

জোটের পক্ষে ১২-০ হবে, নাকি তৃণমূলের ঝোলায় যাবে দু’-একটি আসন, তা জানতে অপেক্ষা করতে হবে। তবে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে থাকা ইতিহাস আর গঙ্গা ভাঙনের এই জেলার মানুষের চোখে যে আর কোনও রুপালি রেখা ধরা পড়বে না, তা বলে দেওয়াই যায়। আম বা রেশম, শুধু সম্ভাবনা হয়েই থেকে গেল। আর প্রতি সন্ধ্যায় নিয়ম করে বাড়তে লাগল ভিন রাজের ট্রেনযাত্রীর সংখ্যা— কাজের খোঁজে। অভাবের তীব্রতার বাসরঘরেই ঢোকে অপরাধের সাপ। শিক্ষায় রাজ্যের মানচিত্রের প্রায় তলানিতে থাকা মালদা শিরোনামে ওঠে বাল্যবিবাহ, শিশুমৃত্যু আর নারী পাচারে। মুদ্রার ও পিঠে থাকে জাল টাকা, মাদক, অস্ত্র পাচারের ঘোলাটে গোলকধাঁধা। চূড়ান্ত বৈভবের কুৎসিত প্রদর্শনের নিচেই আছে হাঘরে মানুষের দল, সীমান্তের ওপারে একটা গোরু পাঠাতে পারলে যাদের হাতে আসে একশো টাকা।

—এসব নিয়ে ভাবার অবকাশ নেই। জল্পনা শুধুই ১২-০, না ১১-১, নাকি ১০-২...?

শুভ্র মৈত্র, মালদা

আগাগোড়াই না-পাওয়ার যন্ত্রণায় ক্লিষ্ট উত্তর দিনাজপুর

ভোট আসে, ভোট যায়, তাতে সাধারণ মানুষের সমস্যার কতটা সমাধান হয়? কালিয়াগঞ্জ, ইটাহার, হেমতাবাদ প্রভৃতি এলাকায় যেমন ইতিহাস আর প্রত্নস্মৃতির ছড়াছড়ি, অন্য দিকে ইসলামপুর, গোয়ালপোখর, চোপড়া আনারস ও চা-বাগিচার পীঠস্থান। উত্তর দিনাজপুরের সদর রায়গঞ্জেই রয়েছে কুলীক পক্ষীনিবাস। জারুল, খয়ের, অর্জুন, ডেঁউয়াসহ নানা গাছের বন। উল্লেখ করতে হয় রায়গঞ্জের সুবাসিত তুলাইপাঞ্জির কথাও। কিন্তু ইতিহাস-ঐতিহ্যসমৃদ্ধ উত্তর দিনাজপুর জেলাকে কতটা পর্যটন আকর্ষণীয় করা হয়েছে? জেলার নিজস্ব লোকসংস্কৃতি খন গানের ঐতিহ্য ধরে রাখতেই বা কতটুকু উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে? অথচ শুধু পর্যটনকে ঘিরেই এই জেলায় গড়ে উঠতে পারত একটি অর্থনৈতিক ভিত্তি। কর্মসংস্থান ঘটতে পারত । কিন্তু কেবল প্রতিশ্রুতিভঙ্গ আর পরিকল্পনার অভাবে এই জেলাকে পিছিয়ে থাকতে হল ।

কৃষিপ্রধান উত্তর দিনাজপুর জেলায় উৎপাদন হয় ধান, গম, সরষে, আখ, ভুট্টা, আনারস। এ ছাড়া জেলার ইসলামপুর ও চোপড়ায় প্রচুর মানুষ চা চাষ করে বর্তমানে তাদের জীবিকা অর্জন করছে। অন্য দিকে জেলার গোয়ালপোখর করণদিঘি ব্লকের অবস্থা তো আরও সঙিন। এই দু'টি ব্লকের অবস্থা দেখলে মনে হবে, এখানে উন্নয়নের কোনও আলোকরেখাই কখনও এসে মাটি স্পর্শ করেনি। সাধারণ মানুষের জীবনধারণ দেখেও প্রশ্ন জাগবে, তারা এই শতাব্দী থেকে কতটা পিছিয়ে? কারণ এই দু'টি ব্লক আজকের দিনে সব দিক দিয়ে বঞ্চিত। ভাবতে অবাক লাগে, এই দু'টি ব্লকে এমন বহু গ্রাম আছে, যেখানে শিক্ষার আলো পৌঁছায়নি। তাদের কাছে শিক্ষার চেয়ে বিড়ি বাঁধাই অনেক বেশি মূল্যবান। আর সেটাকেই প্রধান জীবিকা হিসাবে বেছে নিয়েছে অধিকাংশ মানুষ। গ্রামীণ পরিবারের অল্পবয়সি মেয়েদেরও জেনে-বুঝে এই বিপজ্জনক কাজে নামানো হয়েছে। পরিবারের কর্তাদের বক্তব্য, এখানে শিক্ষার কোনও দাম নেই, লেখাপড়া শিখে কী হবে? গ্রামে কাজের কি কোনও সুযোগ আছে? পরিবারের কর্তাদের মুখের কথা শুনলে আরও অবাক লাগে, এই গ্রামের মেয়েদের বিয়ে হয় তাদের বিড়ি বাঁধার যোগ্যতার নিরিখে।

ভারত সরকার ও রাজ্য সরকার শিক্ষার উন্নয়নে নানা ধরনের পরিকল্পনা নিলেও, উত্তর দিনাজপুর জেলার এই সমস্ত ব্লকে তার বিন্দুমাত্র প্রভাব পড়েনি, তা গ্রামে গেলেই বোঝা যায়। সেই সাবেকি আমলের ভাঙাচোরা রাস্তা। গ্রামের মানুষরা একটু নিশ্চিন্তে চাষবাস করবে, তারও উপায় নেই, কারণ এখনও রাতের অন্ধকারে ভারত-বাংলাদেশের সীমান্ত গ্রাম করণদিঘি ও গোয়ালপোখর হওয়ায় ওপারের দুষ্কৃতকারীরা কাঁটাতারের বেড়া টপকে এসে কৃষকদের ফসল কেটে নিয়ে যায়। তাই বহু মানুষকে গ্রামে কাজ না থাকার দরুন দিল্লি, মুম্বই ও চেন্নাইয়ের মতো শহরে গিয়ে কাজ করতে হয়। এর উপর আর একটি জ্বলন্ত সমস্যা আছে, সেটা হল নারী পাচার। সামনে নেপাল সীমান্ত, বাংলাদেশ সীমান্ত ও বিহার রাজ্য হওয়ায় মাঝেমধ্যে গ্রামে কাজ না থাকায় অল্পবয়সি যুবতীদের কাজের প্রলোভন দেখিয়ে নারী পাচারকারীরা অন্য জায়গায় নিয়ে গিয়ে বিক্রি করে দেয়। অন্য দিকে জেলার রায়গঞ্জের বিন্দল গ্রামের অবস্থা আরও শোচনীয়। এই গ্রামের অবস্থা এতটাই খারাপ যে, শুধুমাত্র বেঁচে থাকার জন্য তাদের কিডনি পর্যন্ত বিক্রি করে দিতে হয় ভিন রাজ্যে গিয়ে।

দীর্ঘ কয়েক দশকেও পরিকল্পিতভাবে নিকাশি ব্যবস্থা গড়ে ওঠেনি ইসলামপুর পুর এলাকায়। আর তা না হওয়ায় ফি-বছর বর্ষায় চূড়ান্ত নাজেহাল হতে হয় এলাকার মানুষজনকে। পুরসভা থেকে বিধানসভা কিংবা লোকসভা ভোটেও ওই নিকাশি ব্যবস্থাই ভোটে অন্যতম ইস্যু হয়ে ওঠে। কিন্তু ভোট পেরিয়ে যাওয়ার পর সব প্রতিশ্রুতিই ফাঁকা আওয়াজ হয়ে যায়।

করণদিঘি বিধানসভা এলাকায় রাস্তাঘাট, পরিস্রুত পানীয় জল থেকে শুরু করে স্বাস্থ্যের হাল দীর্ঘকাল ধরেই বেহাল। কেন্দ্রীয় সরকারের উন্নয়নমূলক কর্মসূচির কোনও ফলই এখনও পৌঁছায়নি এই এলাকার অধিকাংশ গ্রামে। গ্রামীণ হাসপাতালে নেই ডাক্তার, ন্যূনতম চিকিৎসার পরিকাঠামো। গ্রামের অধিকাংশ প্রাথমিক স্কুলেই নেই কোনও শিক্ষক। মানুষ কি শুধু প্রতিশ্রুতিতেই ভুলে থাকবে, আর ভোট এলে বুথে গিয়ে রায় দান করবে?

প্রায় এক দশকেরও বেশি সময় পেরিয়ে গিয়েছে। বেশ ঘটা করেই শিলান্যাস হয়েছিল ইসলামপুর শিল্পতালুকের। গত বিধানসভা নির্বাচনের আগে কালিয়াগঞ্জের একটি অনুষ্ঠান থেকে সেটির উদ্‌বোধনও হয়। তারপরও তো কেটে গিয়েছে পাঁচটা বছর। আজও চালু হল না সেই শিল্পতালুক। ঘাস গজানো ফাঁকা মাঠে গোরু চরে বেড়াচ্ছে, জমির লিজ ও মূল্য নির্ধারণ সংক্রান্ত নানা সমস্যার জেরে বিনিয়োগকারীরা সেমুখো হতে চায় না। এর পরও সরকারিভাবে কর্মতীর্থ নামে একটি প্রকল্পের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছিল। ওখানে জেলার হস্তশিল্পীরা প্রশিক্ষণ, কর্মশালা ইত্যাদির পাশাপাশি বিপণনও করতে পারবেন। চলতি বছরের শেষেই ভবন নির্মাণ শেষ হয়ে কাজ চালু হবে।

এই জেলায় ইতিমধ্যে এমন বহু প্রকল্প ও পরিকল্পনা ঘোষিত হয়েছে, যার হিসাবনিকাশ জেলা প্রশাসনও হয়ত সঠিকভাবে দিতে পারবেন না। জেলাবাসী বুঝে গিয়েছে, বস্তুতপক্ষে ঘোষিত প্রকল্প বাস্তবায়িত হয় মাত্র এক শতাংশ। ভোটের মরশুমে শাসক ও বিরোধী প্রার্থীরা উন্নয়নের ফিরিস্তি নিয়ে তরজা করেন। উপসংহারে তাঁরা প্রতিশ্রুতির ঝুড়ি উলটে দেন। সমস্যাজর্জরিত উত্তর দিনাজপুর জেলাবাসীর কাছে পরিস্রুত পানীয় জল, ন্যূনতম স্বাস্থ্য পরিষেবা এবং গ্রামাঞ্চলের জরাজীর্ণ যোগাযোগব্যবস্থার উন্নয়ন ঘটানোই অন্যতম দাবি। অন্তত এবারের ভোটেও তাঁরা এই পরিষেবাগুলির দিকেই উন্মুখ হয়ে তাকিয়ে আছেন।

তন্ময় চক্রবর্তী, রায়গঞ্জ

ঝটিতি উন্নয়নের বুড়ি ছোঁয়ার চেষ্টা দক্ষিণ দিনাজপুরে কৃষি ও ঐতিহ্য অনাদৃত

ইতিহাসের আকরভূমি দক্ষিণ দিনাজপুর রাজ্যের সব থেকে পিছিয়ে পড়া জেলা। দিঘিময় এবং মিথ-পুরাণে পশ্চিমবঙ্গের অন্যান্য জেলার থেকে অনেক বেশি ইতিহাসসমৃদ্ধ। কাঠের মুখোশ বা মোখা শিল্প, ঢোকরা ও তাঁত ঐতিহ্যময়। সুপ্রাচীন ইতিহাস, সভ্যতা ও সংস্কৃতির পীঠস্থান হওয়া সত্ত্বেও প্রান্তিক জেলা দক্ষিণ দিনাজপুর তবুও পিছিয়ে পড়া। কৃষি এই জেলার প্রধান জীবিকা, কিন্তু কৃষিনির্ভর শিল্পর বিকাশ ঘটেনি তেমনভাবে।

২০১১ সালের বিধানসভা নির্বাচনে ছয়টি আসনের মধ্যে পাঁচটিই জয় করেছিল তৃণমূল। একমাত্র কুশমান্ডি দখলে রেখেছিল আরএসপি। গত পাঁচ বছরে এই জেলায় মোট ১১টি পাকা সেতু তৈরি হয়েছে। প্রধানমন্ত্রী সড়ক যোজনা পৌঁছে গিয়েছে প্রত্যন্ত গ্রামে। হিলি সীমান্তের কাঁটাতারের বেড়ার ওপারের গ্রামগুলিতেও বিদ্যুৎ এসেছে। জেলায় দু'টি মালটিপারপাস হাসপাতাল, ডিগ্রি কলেজ, পলিটেকনিক, প্রায় প্রতিটি ব্লকে কৃষি মান্ডি, আদিবাসী ও সংখ্যালঘু ছাত্রছাত্রীদের জন্য হস্টেল— উন্নয়নের ফিরিস্তি লম্বা। ইতিমধ্যে পঞ্চায়েত সমিতিসহ সিংহভাগ গ্রাম পঞ্চায়েত দখল নিয়েছে শাসকদল। বালুরঘাট ও গঙ্গারামপুর পৌরসভাও বামেদের হাতছাড়া হয়েছে। তা সত্ত্বেও এই জেলার ছয়টি বিধানসভা কেন্দ্রেই তৃণমূলের ভোট কমবে। অন্যতম কারণ শাসকদলের গোষ্ঠীকোন্দল, তৃণমূলের রাজ্য নেতৃত্বের হুঁশিয়ারি সত্ত্বেও।

এই জেলার তপন বিধানসভা কেন্দ্রটি স্বাধীনতার পর থেকেই খরাপ্রবণ এলাকা বলে চিহ্নিত। ভূগর্ভস্থ জলের স্তর নেমে যায় হু হু করে। অধিকাংশ এলাকাতেই মেলে না পানীয় জল। প্রায় প্রতিটি গ্রামের মানুষই তখন দূষিত জেনেও স্থানীয় পুকুর বা দিঘির জল নিত্যপ্রয়োজনীয় কাজে ব্যবহার করে। তপন ব্লকের আটটি এলাকার মানুষ শুধুমাত্র পানীয় জলের হাহাকারকে ইস্যু করে ভোট বয়কটের ডাক দিয়েছেন। অথচ তপন এবং গঙ্গারামপুর— দুই এলাকা দিয়েই বয়ে চলছে পুনর্ভবা নদী। ভূতত্ত্ববিদদের পর্যবেক্ষণে যে নদী এক অত্যাশ্চর্য বিষয়। এই নদীর অন্তঃস্থলেই রয়েছে এক অন্তঃসলিলা। পর্যবেক্ষণ অনুযায়ী, জল প্রকল্পে কেন্দ্রের থেকে ৪০০ কোটি টাকা পাওয়ায় যে কাজ শুরু হয়েছে, তার ফল মিলবে কবে? জলের হাহাকার মিটবে কীসে? প্রশ্ন কেন্দ্রের প্রায় সব মানুষেরই। সমস্যা যখন পানীয় জলের, তখন সেই ক্ষোভ কোনও প্রতিশ্রুতিতেই চাপা থাকে না। সাড়ে তিন দশকের জমানা গিয়ে পরিবর্তনের জমানাতেও জলসংকট মেটেনি।

মুখা শিল্পের জন্য খ্যাত কুশমান্ডি বিধানসভা এলাকার বিরাট অংশের মানুষ দীর্ঘকাল ধরে এই শিল্পের সঙ্গে যুক্ত। দুই জমানাতেই তাদের শিল্পের বিকাশ বলতে মেলায় মেলায় অংশগ্রহণ এবং বিদেশ পাড়ি দেওয়া। কিন্তু সর্বার্থে এই শিল্পের উন্নয়ন ঘটলে আরও কিছু মানুষের কর্মসংস্থান হত। সুরাহা হত জীবন-জীবিকার। এই এলাকার আরও একটি অন্যতম শিল্প ঢোকরা। মূলত পাটকেন্দ্রিক এই শিল্পের নিদর্শন দেখা যায় মাদুরসহ বিভিন্ন সামগ্রীতে। এই শিল্পের সঙ্গেও যুক্ত এলাকার বহু মানুষ। কিন্তু উন্নয়নের গতি সেই অর্থে মন্থর। ফলে বর্তমান প্রজন্মের আর কেউ এই শিল্পকে জীবন-জীবিকা করতে চাইছে না।

হরিরামপুর ও কুশমান্ডি, দুই এলাকাই দিঘির জন্য পরিচিত। দিঘিগুলিকে ঘিরে পর্যটন ভাবনা অনেক দেরিতে হলেও শুরু হয়েছে। কিন্তু পর্যটক টানতে যে পরিকাঠামোর দরকার তা হয়নি। রাস্তাঘাট, থাকা-খাওয়ার ব্যবস্থা উন্নত না হলে, দিঘিগুলির সর্বাঙ্গীণ সৌন্দর্যায়ন না ঘটলে কি পর্যটনকেন্দ্র আকর্ষণীয় হয়ে উঠতে পারে? শুধু তা-ই নয়, পুকুর বা দিঘিগুলিতে যে পরিমাণ মাছ চাষের সম্ভাবনা রয়েছে, তা দিয়েই সারা বছর একটা বিরাট সংখ্যক মানুষের জীবিকানির্বাহ হতে পারে।

তাঁত শিল্পের জন্য পরিচিত গঙ্গারামপুর কেন্দ্রের বেশ কয়েকটি এলাকা। এই এলাকার তাঁতের শাড়ি অন্যান্য জেলার চেয়ে দামে যেমন কম, তেমনই লাভজনক। প্রায় ২৫ থেকে ৩০ শতাংশ মানুষ এই শিল্পের উপর নির্ভরশীল। প্রযুক্তির কোনও ছোঁয়া বা আধুনিকীকরণ ঘটেনি এই শিল্পের বিকাশে। সরকারি সাহায্য কিছুই কি প্রায় নেই? আসলে তাঁত শিল্পের বিকাশে প্রযুক্তি এবং আধুনিক ডিজাইনের মেলবন্ধন না ঘটলে তাকে বাজারমুখী করে তোলা যায় না। শুধু সরকারি মেলার উপর নির্ভর করে তো তাঁত শিল্পীরা বেঁচে থাকতে পারেন না।

তা বলে কি পিছিয়ে পড়া এই জেলায় কোনও উন্নয়নই ঘটেনি? বালুরঘাট জেলা হাসপাতাল ও গঙ্গারামপুর হাসপাতাল লাগোয়া সুপারস্পেশালিটি হসপিটাল মাথা তুলেছে। সমস্ত বিভাগ চালু করা যায়নি, চিকিৎসকেরও অভাব। অধিকাংশ রোগীই রেফারড হচ্ছেন জেলা হাসপাতালে। গ্রামীণ স্বাস্থ্যকেন্দ্রেও নেই চিকিৎসক, পরিকাঠামো তো দূর অস্ত। কৃষি কলেজ হয়েছে, পলিটেকনিক থেকে শুরু করে ডিগ্রি কলেজও মাথা তুলেছে। কিন্তু এখনও পর্যন্ত পঠনপাঠন শুরু হয়নি অধিকাংশ জায়গায়। প্রায় সব এলাকাতেই প্রাথমিক থেকে উচ্চবিদ্যালয় রয়েছে। তবে শিক্ষকের অভাব প্রকট।

লক্ষণীয়, পিছিয়ে পড়া জেলাকে সাত তাড়াতাড়ি উন্নয়নের আলোকে ধুয়ে দেওয়ার প্রচেষ্টা। মূলত কৃষিপ্রধান জেলা এবং অধিকাংশ মানুষের জীবন-জীবিকা কৃষিভিত্তিক হওয়া সত্ত্বেও কৃষকরা কিন্তু ফসলের সঠিক দাম এখনও ঘরে তুলতে পারেন না। এমনকি কৃষিভিত্তিক শিল্প এই জেলায় এখনও পর্যন্ত গড়ে না ওঠায় অর্থনৈতিক উন্নয়ন ঘটেনি। সরকারে যারাই আসুক, তারা কি পিছিয়ে পড়া জেলার মূল সমস্যাগুলিকেই উন্নয়নের অন্যতম হাতিয়ার হিসেবে বিবেচনায় আনবে? জেলাবাসীর প্রশ্ন কিন্তু সেটাই।

মৃদুল হোড়, বালুরঘাট

১০৬-এ প্রথম ভোট

ভারত-বাংলাদেশ দুই দেশের ছিটমহল বিনিময় চুক্তি কার্যকর হয়েছে গত বছর ৩১ জুলাই। চুক্তি অনুযায়ী দুই দেশের অভ্যন্তরের ভূখণ্ডগুলি জুড়ে গিয়েছে নিজ নিজ দেশে। এমনকি ভারতের অভ্যন্তরে থাকা সাবেক বাংলাদেশি ছিটবাসীরাও হয়ে গিয়েছেন এ দেশের নাগরিক। এর পর প্রাপ্তবয়স্কদের নাম ভোটার তালিকাভুক্ত হওয়ার প্রক্রিয়াও প্রায় শেষ। সাবেক ছিটমহলের পরিকাঠামো উন্নয়ন নিয়ে হাজার একটা প্রশ্ন থাকতেই পারে। রাস্তাঘাট, স্বাস্থ্য, শিক্ষা, বিদ্যুৎ নিয়েও জমে উঠতে পারে ক্ষোভের পাহাড়। জমির অধিকার কিংবা আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন নিয়েও বলা যেতে পারে অনেক কথা। তবে সেইসব প্রসঙ্গ ভোটের মরশুমে অনেকটাই থিতিয়ে পড়েছে মশালভাঙা, পোয়াতুর কুঠি, বালাপুকুরি নামের পূর্বতন ছিটমহলগুলিতে। সব মিলিয়ে এখানে ৯৮২১ জন ভোটার। এবারই তাঁরা প্রথম ভোট দেবেন। কোনও কোনও পরিবারের দুই প্রজন্ম একই সঙ্গে পাবেন ভোটের স্বাদ। এতকাল যাঁরা ভোট চোখে দেখেননি, বুথ, ভোটকর্মী, প্রার্থী, প্রচার— এসব শুধু শুনেই এসেছেন, তাঁরা এই প্রথম ভোটারের মর্যাদা পেয়েছেন ভোটার তালিকায় নাম নথিভুক্ত হওয়ায়। তাই ২২ বৈশাখ দিনটিকে ক্যালেন্ডারের পাতায় দাগিয়ে রেখেছেন। ভোটের দিনটি তাঁদের কাছে সত্যিই যে গুরুত্বপূর্ণ। আর হবে না-ই বা কেন? জীবনের শতবর্ষ পেরিয়ে আরও পাঁচটি বছর অতিক্রম করেছেন আজগর আলি। হিসেবটা তাঁর ও পরিবারেরই দেওয়া। দুই দেশের স্বাধীনতা দেখেছেন। চোখের সামনে না হলেও দুই দেশের প্রায় সব সামাজিক রাজনৈতিক উত্থান-পতন পরোক্ষে হলেও উপলব্ধি করেছেন। কিন্তু এতগুলি শীত, বসন্ত, গ্রীষ্ম, বর্ষা পেরিয়েও কখনও ভোট-বুথ চোখে দেখেননি। ইতিমধ্যে ভোটের ধরনধারণে কত বদল ঘটে গিয়েছে। ১০৬ বছর বয়সে পৌঁছেও যে প্রথম ভোট দেওয়া যায় তা কি কেউ ভাবতে পারে! কিন্তু ভাবা নয়, বাস্তবিকই ভোটার হলেন মশালডাঙার আজগর আলি। ২২ বৈশাখ দিনটি ঘিরে চরম উত্তেজনা তাঁর চোখে-মুখে। লাঠি ছাড়া এক পা-ও চলতে পারেন না। কিন্তু মনে রেখেছেন, শবেমেরাজের দিনই ভোট। তাঁর ছেলে রেলাল হোসেনও এই প্রথম ভোটদান করবেন। বাবাকে সঙ্গে নিয়ে বুথে যাওয়ার দায়িত্ব তাঁরই। বোরো চাষের এই সময় জলসেচের দিকে চোখ রাখতে হয়, তা না হলে ফসলের ক্ষতি। ওই দিন জমির কাজ বন্ধ রাখবেন। শুধু বাবা-ছেলেই নয়, বেলালের ছেলে জানাল আবেদিনও এবার ভোটার। ক্যালেন্ডারে সে ৫ মে দাগিয়ে রেখেছে। তার মানে শুধু ১০৬ বছর বয়সি আজগর আলিই নন, একই পরিবারের তিন প্রজন্মই এই প্রথমবার ভোট দেবেন। নির্বাচন কমিশনের লোকজন এখানে এসে দেখিয়ে গিয়েছেন, কীভাবে ইভিএমে পছন্দের প্রার্থীর নামের পাশের বোতাম টিপতে হবে। দলের লোকজন নিয়ে প্রার্থীরাও এসে প্রচার সেরে গিয়েছেন। কোচবিহার জেলার ছ'টি বিধানসভা কেন্দ্রেই ভোট রয়েছে পূর্বতন ছিটমহলবাসীদের। তাই প্রথমবারের ভোটার প্রত্যেকের কাছেই সে দিন আগে ভোট, পরে অন্য কাজ।

1 AVATAR
2 BOBBY
3 CHAND
4 DAVID
5 ESWAR
6

ভোটে ভাবলেশহীন

বিহার আর পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যের সীমানায় পড়ে রহমতপুর দ্বীপনগর। উত্তর দিনাজপুর জেলার রায়গঞ্জ এলাকার গৌরী পঞ্চায়েতের অন্তর্ভুক্ত ওই প্রত্যন্ত গ্রাম। কুলিক আর নাগর নদীর জলপ্রবাহ এসে মহানন্দায় মিশেছে রায়গঞ্জের বিশহারা গ্রামে। তারই ওপারে রায়গঞ্জ বিধানসভা কেন্দ্রের রহমতপুর দ্বীপনগর। গ্রামটি একদিকে যেমন বিহার সীমানা ঘেঁষা, অন্য দিকে নদীবেষ্টিত। এখানকার প্রায় হাজার দেড়েক মানুষকে একরকম দ্বীপবাসীই বলা যায়। গ্রাম হলেও এখানে বসে না কোনও বাজারহাট। কাঁচা শাকসবজি থেকে শুরু করে নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসপত্রের জন্য গ্রামবাসীদের ছুটতে হয় আবেদপুর। সেটি কিন্তু রাজ্যের সীমা ছাড়িয়ে প্রতিবেশী রাজ্য বিহারের মধ্যেই পড়ে। শুধু তো বাজারহাট কিংবা দোকানপসার নয়, এ গ্রামের ছেলেমেয়েদের জন্য যে হাই স্কুল, সেটাও ওই বিহার রাজ্যের সীমায়। আবেদপুর থেকে সেটার দূরত্ব আরও কয়েক কিলোমিটার। হাতিয়া হাই স্কুলে ঠাঁই না হলে ছুটতে হয় ইটাহারের সোরাহার হাই স্কুলে। দ্বীপনগরে একটি মাত্র প্রাথমিক স্কুল আছে। কিন্তু সেটাও সপ্তাহের চার দিন শিক্ষকবিহীন। ফলে গ্রামের শিশুদের স্কুলের প্রতি গরজ থাকলেও তার পরিণতি কেমন তা আর বিশদ বর্ণনার প্রয়োজন রাখে না। আর এই দ্বীপভূমির মানুষগুলির দৈনন্দিন জীবনযাপন যে কীভাবে অতিবাহিত হয়, সেটাও বুঝিয়ে বলার দরকার পড়ে না। স্বাস্থ্যকেন্দ্রে পৌঁছাতে হলেও দু'টি নদীর উপর নড়বড়ে সাঁকো পেরতে হয়। স্বাস্থ্যকেন্দ্র বাদ দিলে একমাত্র রায়গঞ্জ জেলা হাসপাতাল। সেটার দূরত্ব ২২ কিলোমিটার। সে পথ পাড়ি দিতে একমাত্র ভরসা যদি নদীর পাড়ে কোনও গাড়ি বা মোটরবাইক মেলে তবেই। তা ছাড়া চলাচলের জন্য লাগে রাস্তা, যা আছে তা দিয়ে চলাচল করা যায় না। এহেন এক গ্রামে দ্বীপান্তরিত হয়েই দিন গুজরান করে মানুষ। স্বাধীনতা, গণতন্ত্র, উন্নয়ন— এসব কথা গ্রামবাসীরা যুগের পর যুগ ধরে শুধু কানেই শুনেছে, কিন্তু ওসব আসলে কী তা প্রত্যক্ষ করেনি। এ রাজ্যের গ্রামজীবনের যে সহজ-সরল ছন্দ-গতি, তার ছিটেফোঁটাও মিলবে না তল্লাটে। জীবন এক অভিশপ্ত পাথরের মতো থেমে আছে এখানে।

দিনকয়েক পরই বিধানসভা ভোট। এখানে তার হাওয়ায় কোনও তাপ-উত্তাপ নেই। তবে ভোটবাবুদের আসা-যাওয়া আছে। প্রতিশ্রুতি দিতেও কেউ বাকি রাখেন না। কিন্তু দ্বীপনগরের মানুষ জানে, ওইসব কথা মিথ্যে। তারা ভাবলেশহীন। ভোট তো কোন ছার, কোনও কিছুতেই আজ আর তাদের কিছু আসে-যায় না। কোনওরকমে বেঁচে থাকাটাই তাদের কাছে মূল্যবান এবং একমাত্র।

অন্য ভোট

আমাদের জাতীয় ফুলের নাম কী? জাতীয় সংগীত, প্রধানমন্ত্রী? ভারতীয় ভূখণ্ডে এই তিনটি প্রশ্নের উত্তরে কেউ যদি শালুক, 'আমার সোনার বাংলা' আর শেখ হাসিনা— এই উত্তর দেয়, আপনি তাকে ভারত-বিদ্বেষী অথবা অনুপ্রবেশকারী কিংবা... যা খুশি ধরে নিতে পারেন। কিন্তু এই ভূখণ্ডের সীমান্ত জেলা

কোচবিহারের শীতলদহ গ্রামে থেকেও যদি তাকে বাংলাদেশের স্কুলে পড়তে হয়, আর সে বিদ্যালয় শ্রেণিকক্ষের শেখানো বুলি যদি সে আওড়ে যায়, তবে দোষটা কার? এখনও ওই গ্রামের চল্লিশজন পড়ুয়া বাংলাদেশ স্কুলের ছাত্র। এখনও রাতে কোনও সন্তানসম্ভবা প্রসবযন্ত্রণায় কাতরে উঠলে তাঁকে ভ্যানে চাপিয়ে রওনা দিতে হয় লালমণির হাট সদর হাসপাতালে। নদী পারাপার ছ'টা বাজতেই বন্ধ, ঘড়ির কাঁটা মিলিয়ে নৌকা বাঁধা পড়ে ডাঙায় পোঁতা খুঁটিতে রীতিমতো শিকল তালা দিয়ে। বিগত পাঁচ বছর প্রশাসনের কড়া নজরে এ ব্যাপারে কোনও ঘাটতি নেই। তবে গ্রামে এখনও নদীর বালুতট পেরিয়ে বিদ্যুতের তার ঢোকেনি। কোনও উৎসব-পরবে জ্বলেনি আলোর রোশনাই। রাতবিরেতে লণ্ঠন আর কুপি সম্বল করেই চলাফেরা। তবে সব ঘরেই প্রায় মোবাইল ফোন আছে। কিন্তু তার চার্জ দিতে সীমান্ত পেরতে হয়। যেতে হয় মোঘলহাটের দুর্গাবাড়ি বাজার। চায়ের দোকানে অন্তত এক কাপ লিকারের দাম চোকাতে হয়, তারই ফাঁকে চার্জ। ভারতীয় মানচিত্রে এই গ্রামটি দিনহাটার শীতলদহ ২ নম্বর গ্রাম পঞ্চায়েতের জারিধরলা দবিরস গ্রাম। তবে সিতাই বিধানসভা কেন্দ্রের এই গ্রামটি ভারত ভূখণ্ড থেকে বিচ্ছিন্ন। কারণ, সিঙ্গিমারি ও গিরিধারী নদী। সারা বছর নয়, শুখা মরশুমে বালুরচর বর্ষায় বানভাসি হয়। অন্য সময় গ্রাম বা পঞ্চায়েত নামগোত্র হারালেও বিধানসভা ভোটে বুথ নম্বর ৬/২৬৮ আর ৬/২৬৯ চিনবে প্রায় সবাই। আর প্রার্থী-দল সবার নজরেই থাকে দরিবস আর জারিধরলা। সাত হাজার বাসিন্দা এই গ্রামে, দু'হাজারেরও বেশি ভোটারকে কি হেলাফেলার জো আছে কারও? তাই ভোট এলেই প্রার্থী-দলীয় কর্মী-সমর্থকদের পদধূলি পড়ে। প্রতিশ্রুতিও দেয় সব পক্ষই। তবে এবার আর ভোট চাইতে আসা প্রার্থী বা দলের কাছে কোনও অভাব-অভিযোগের প্রশ্ন তোলেনি গ্রামবাসীরা। কারণ, যাদের দিন প্রতিদিন অতিবাহিত হয় ভিন দেশের ভরসায়, এমনকি বিপদ-আপদেও সেই ভিন দেশের বাসিন্দারাই যাদের পাশে, তাদের কাছে ভোট দেওয়া না-দেওয়া তো সমান।

ভোটে বাদ

ভোট দেওয়ার অধিকার মিলেছিল একুশ বছর আগে। হিসেব অন্তত সেই কথা বলে। আদার সেক্স বা থার্ড জেন্ডার, যে ভাষাতেই ওদের চিহ্নিত করা হোক না কেন, সমাজে ওরা 'হিজড়ে' নামেই পরিচিত। সাধারণ নাগরিক ওই আদার বা থার্ড-দের বেশ আলাদা নজরেই দেখে। আর ওরা সেটা ভালই জানে। হয়ত সে কারণেই নিজেদের বৃত্তের বাইরে ওরা গা ঘেঁষে না। তবে ১৯৯৪ সালে ওদের ভোটাধিকার স্বীকৃতিতে সিলমোহর দিয়েছিল দেশের উচ্চ আদালত। তারপর গ্রাম পঞ্চায়েত, পুরভোটে ওরা শুধু ভোটার নয়, প্রার্থী হিসেবে রীতিমতো প্রতিদ্বন্দ্বিতাও করেছিল। হারজিতের বিষয়টা একেবারেই ভিন্ন। ভোটযুদ্ধে ওদের অংশগ্রহণ তখন খবরের শিরোনামে উঠে এসেছিল। এবারও অন্তত দু'টি কেন্দ্রে ওরা হেভিওয়েট প্রার্থীর বিরুদ্ধে লড়ছে। অথচ জলপাইগুড়ির হিজড়ে আশ্রমের ৪২ জন সদস্যের নামই নেই ভোটার তালিকায়। অন্য দিকে আলিপুরদুয়ার কেন্দ্রে এবার এ ধরনের ভোটার আছে এক ডজন, যারা নিজেদের পরিচয়েই বুথে গিয়ে তাদের গণতান্ত্রিক অধিকার প্রয়োগ করবে। কিন্তু পাশের জেলায় কীভাবে ঘটল এমনটা? ক্ষোভ-ধিক্কার ছুড়ে দিল সরকার-প্রশাসন-ভোটপ্রার্থী-দলের উপর। কেন নেই ওদের নাম ভোটার তালিকায়? এ প্রশ্ন ওদের হয়ে কে তুলবে? শুধু যে নাম নেই তা তো নয়, ওদের পরিচয়পত্রও নেই। তাহলে কি ওরা এ দেশের নাগরিক নয়? এ প্রশ্নই বা কে রাখবে ওদের হয়ে? ভোট-প্রচার ইত্যাদির কথায় ওরা এখন গা-ঝাড়া দিয়ে উঠছে। প্রশ্ন, 'হাইকোর্ট-সুপ্রিম কোর্ট-আন্দোলন-মিছিল অনেক হল। কিন্তু আমাদের নাম নেই লিস্টে। তার মানে আমাদের কোনও অধিকার নেই। তাহলে আর সরকার-প্রশাসন নিয়ে আমরা ভাবব কেন?' বাসে-ট্রেনে তালি বাজিয়ে পয়সা রোজগার করাটা এখনও ওদের পেশা। বাড়ি বাড়ি গিয়ে বাচ্চা নাচিয়ে আশীর্বাদের বদলে টাকা নেওয়াটা এখনও রীতি। তাই কি মাঝখান থেকে ফাঁক পড়ে গেল ওই ৪২ জন হিজড়ে সদস্য? ২৩ থেকে ৫০ বয়স্করা মোট ভোটার সংখ্যার হিসেবে অতি নগণ্য। ভোট জেতা বা হারার হিসেবেও ফ্যাক্টর নয়। তা বলে ওদের পরিচয়পত্র থাকবে না, নাম উঠবে না ভোটার তালিকায়! সরকার-সমাজ-রাজনীতির বিরুদ্ধে চাপা ক্ষোভ রয়েই গেল। গণতান্ত্রিক অধিকার— সেটুকু থেকেও বঞ্চিত হল। এসব কথা কার কাছে কীভাবে জানাবে, জানা নেই ওদের। কিন্তু একবার ভোট দিতে চায় ওরা। তা না হলে সরকারের কী দরকার ওদের? জলপাইগুড়ি হিজড়ে আশ্রমেই তো ওরা বেশ আছে।

ডুয়ার্স ব্যুরো

এখন ডুয়ার্স প্রাপ্তিস্থান

শিলিগুড়ি
বিশ্বাস বুক এজেন্সি- ০৩৫৩-২৫৩১০১৭
শিবমন্দির
অনুপ দাস- ৯৮৩২০২৯৫১৪
জলপাইগুড়ি
ভবতোষ ভৌমিক- ৯৭৩৩২৪৬৯১৩
হলদিবাড়ি
অমল দাস- ৯৪৩৪৮০৬৩৮৩
মালবাজার
মিনি বুক স্টোর- ০৩৫৬-২২৫৫০১৫
মালবাজার
ভবতোষ রায়চৌধুরী- ৯৮০০৩০৬৫২৭
চালসা
দিলীপ সরকার- ৯৭৭৫৪১৫১৪৪
বিন্নাগুড়ি
রমেশ শর্মা, সিটি বুক স্টল- ৯৪৩৪৮০৯৫৯০
বীরপাড়া
বরুন ঘোষ, পোকিসা- ৯৫৯৩৩৫৪১৫২
লাটাগুড়ি
বিশ্বজিৎ রায়- ৯৯৩২৫৪৬৩২০
ময়নাগুড়ি
দেবাশিষ বসুভাট- ৯৯৩৩১৯০৮৫৮
ধূপগুড়ি
অমিত কুমার দে- ৯৬৪৭৭৮০৭৯২
ফালাকাটা
অমল চন্দ্র পাল- ৯৪৩৪৪১২৬৪৯
আলিপুরদুয়ার
দীপক হোড়- ৭৬৭৯৮৯৫৩০৭
কোচবিহার
জয়ন্ত দাস- ৯৪৩৪২১৭০৮৪
আরতি ঘোষ, কাছাড়ি মোড়
তুফানগঞ্জ
দীপেন্দ্র সাহা- ৮৯৭২০২০৬০০
মাথাভাঙা
বরুন সাহা- ৯৪৩৪৩৩৭৭৬৮
দিনহাটা
আবেদ আলি- ৯৮৩২৩৪৭৪৫১
মালদা
অমিত কুমার দাস, পুষ্প নিউজ এজেন্সি- ৯৯৩২৯৬৭৯৯১
রায়গঞ্জ
সুরঞ্জন সরকার- ৯৪৩৪৪২৩৫২২

ইচ্ছুক এজেন্টরা যোগাযোগ করুন
৯৮৩০৪১০৮০৮

কলকাতায় এখন ডুয়ার্স পরিবেশক
০৩৩-২২৫২৭৮১৬

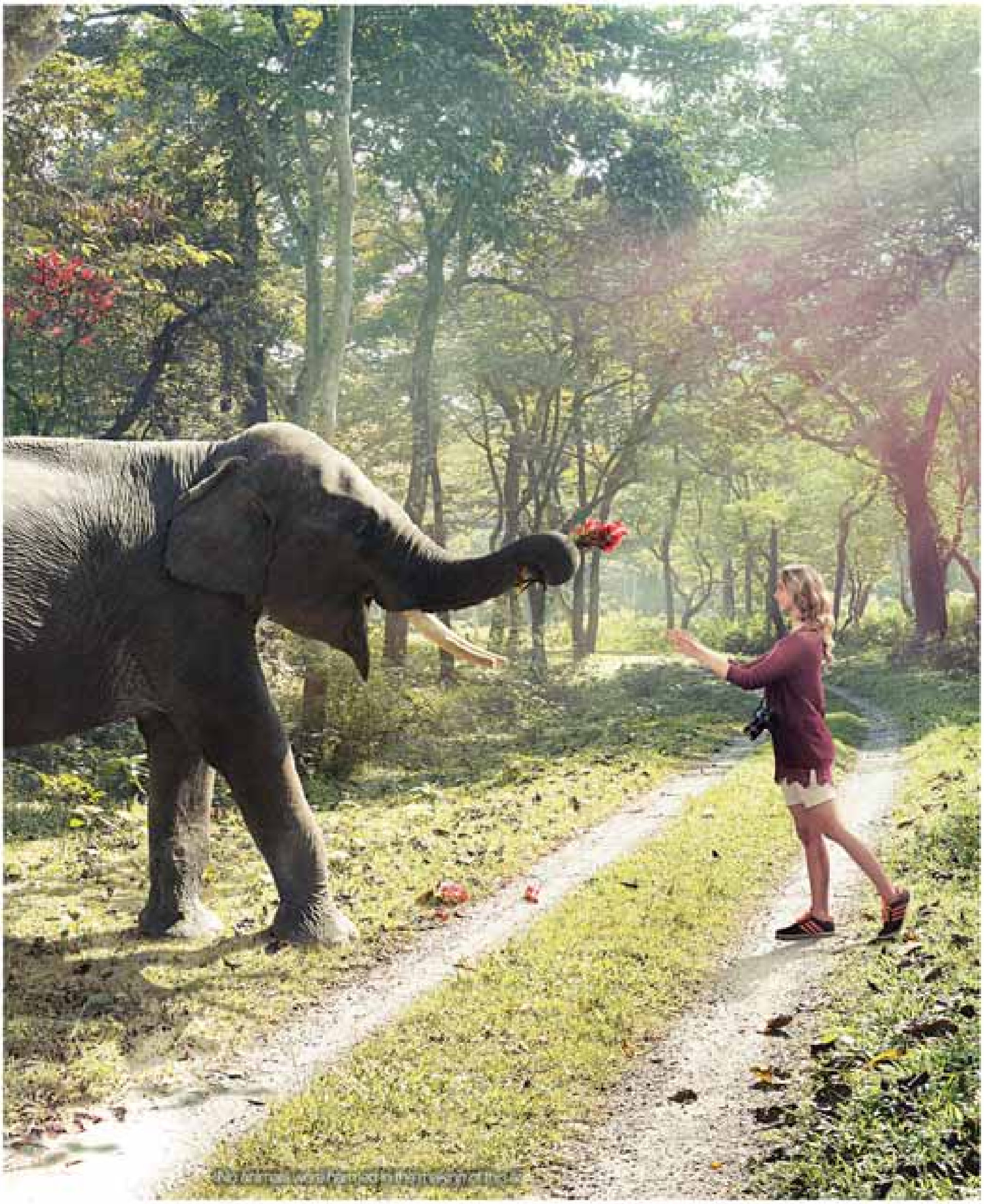

ডুয়ার্সের ডাকে সাড়া দিন ডুয়ার্স জুড়ে ছড়িয়ে আছে জঙ্গলের রোমাঞ্চকর রাস্তা – চোখের জন্য আরামদায়ক তো বটেই, শুধু কান পাতলেও ডুয়ার্স আপনাকে হতাশ করবে না। নানা রকম বন্যপ্রাণীর ডাকের সঙ্গে এখানে মিশে যায় শুকনো পাতার মরমর। পাশ দিয়ে বয়ে যায় পাহাড়ী নদী; তার বরফগলা জলে আজও সেই আদিম হিমবাহের ইশারা শোনা যায়। অরণ্য এখানে অনন্ত – সে পাখির ডাকে রোজ ঘুমিয়ে পড়ে, আবার পাখির ডাকে জাগে।

EXPERIENCE Bengal
THE SWEETEST PART OF INDIA
DEPARTMENT OF TOURISM,
GOVERNMENT OF WEST BENGAL

www.wbtourism.gov.in/www.wbtdc.gov.in www.facebook.com/tourismwb www.twitter.com/TourismBengal ☎ (033) 2243 6440, 2248 8271

কালিম্পং-এর অঢেল আশীর্বাদ নিয়েও পাহাড়ি ঢালে হড়কে যাবেন না তো হরকাবাহাদুর ?

দূরবিন

গত বিধানসভার নির্বাচনে কালিম্পং কেন্দ্রে হরকাবাহাদুর ছেত্রী গোর্খা জনমুক্তি মোর্চার প্রার্থী হিসেবে নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে বিজয়ী হয়েছিলেন। এবার তিনি গোর্খা জনমুক্তি মোর্চা দলের প্রচণ্ড বিরোধী। তৃণমূল থেকে জানানো হল, তিনি এবার তৃণমূলের প্রার্থী। পাহাড়ের পৃথক গোর্খাল্যান্ড রাজ্যের যে আবেগের স্রোত বেয়ে প্রথমে সুবাস ঘিসিঙের জিএনএলএফ-এর জন্ম, সেই আবেগের স্রোতে লাগাম পরাতে গিয়েই সুবাস ঘিসিঙের পতন। আবার পৃথক গোর্খাল্যান্ড রাজ্যের দাবিতে বামের পিঠে চড়ে, গোর্খা জনমুক্তি মোর্চার অন্যতম সওয়ারি হয়ে, এতদিন পাহাড়ের জনতার মনে পৃথক রাজ্যের উত্তাপ ছড়ানোর পরে হরকাবাহাদুর ছেত্রীর নাম রাজ্য ভাগের বিরুদ্ধে দৃপ্ত ঘোষণায় তৃণমূল দলের প্রার্থীতালিকায় নাম প্রকাশের পর পাহাড়ের জনতা, বিশেষ করে নেপালি ভাষীদের মনে যে ক্ষোভ তা আঁচ করতে না পারার মতো প্রজ্ঞার অভাব তাঁর ছিল না। তাই তিনি দু'দিন বাদে জানালেন, তিনি তৃণমূলের প্রার্থী নন, তিনি তাঁর সদ্যপ্রতিষ্ঠিত জন আন্দোলন পার্টির পক্ষ থেকে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবেন। তৃণমূলও ঘোষণা করেছে, তারা হরকাবাহাদুর ছেত্রীকে সমর্থন করবে।

ইতিমধ্যেই পাহাড়ের নেপালি ভাষীদের মধ্যে হরকাবাহাদুরের জনপ্রিয়তার যা ক্ষতি তা ঘটে গিয়েছে। তাদের কাছে বার্তা পৌঁছে গিয়েছে, হরকা নেপালিদের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করেছেন। কারণ যেভাবেই দাবি করুক না কেন, সেই ১৯০৭ সালে মাথাচাড়া দিয়ে ওঠা পৃথক গোর্খাল্যান্ডের দাবি পাহাড়ের ভাবনা থেকে মুছে ফেলা গিয়েছে বলে যাঁরা ভাবছেন, তাঁরা প্রচণ্ড ভুল করছেন। জাতিসত্তার প্রশ্নটির মতো জটিল বিষয়টি একটা বা দুটো চুক্তি কাগজ-কলমে ঘটালেই মিটে যায় না। এটি সুপ্ত আগ্নেয়গিরির মতো অগ্ন্যুৎপাতের অপেক্ষায় থাকে। সামান্য সুযোগ পেলেই প্রচণ্ড গতিতে তপ্ত লাভার স্রোতের মতো বেরিয়ে আসে। শুধু এই জেলাতেই নয়, সারা রাজ্য জুড়েই গোর্খাল্যান্ড নিয়ে একটা আলাদা কৌতূহল আছে। কারণ কংগ্রেস ও সিপিএম-কে পাহাড়ের রাজনীতি থেকে উচ্ছেদ করার পর গোর্খাল্যান্ড রাজ্যের দাবিতে লাগাম যাঁর হাতে উঠে এসেছে, তাঁর কথাই এখানে শেষ কথা হয়ে দাঁড়িয়েছে। সুবাস ঘিসিঙের আমলেই সেটা যেমন সত্য ছিল, তেমনি বিমল গুরুংদের রাজত্বের ক্ষেত্রেও।

এবারই প্রথম পাহাড়ের রাজনীতিতে একটা গভীর প্রশ্ন উঠে এসেছে— বিমল গুরুংদের হুকুমদারিকে অগ্রাহ্য করে হরকাবাহাদুর গুরুংদের প্রার্থীকে পরাজিত করে নির্বাচিত হতে পারবেন কি না ? এর ফলাফলের উপরই নির্ভর করছে বিমল গুরুঙের আগামী দিনের রাজনৈতিক অস্তিত্ব। হরকাবাহাদুর যদি জিতেও যান, তবে তিনি আগামী দিনে পাহাড়ের রাজনীতির নতুন সম্রাট হতে পারবেন এমন কোনও নিশ্চয়তা দেওয়া যাবে না। তবে বিমল গুরুঙের নেতৃত্বের যে অস্ত ঘটবে, সেটা কিন্তু বলে দেওয়া যায়। এটা বুঝতে হলে কালিম্পঙের ইতিহাস তথা জাতিসত্তা, যাকে বলা যায় এথনিসিটি-র অবস্থান নিয়ে আলোচনা করা দরকার। কারণ বর্তমান মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় যে লেপচা উন্নয়ন পরিষদ গঠনের মাধ্যমে পাহাড়ের রাজনীতির জাতিগত বিন্যাসের অবস্থানের পরিবর্তন ঘটিয়ে পৃথক রাজ্য গঠনের পাহাড়ি ঐক্যের সুরে ফাটল ধরাতে চেয়েছেন, তা শুরু করেছেন এই কালিম্পং থেকেই।

কালিম্পং শব্দটি এসেছে লেপচা শব্দ থেকে। লেপচা ভাষায় 'কা' অর্থ আমরা। 'লেম' কথাটির অর্থ খেলা করি। 'পাং'-এর অর্থ শৈলশিরা। অর্থাৎ লেপচা ভাষায় 'যে শৈলশিরায় আমরা খেলা করি।' অন্য মতে এর উচ্চারণ কা-লেন পাং (Kaa-Len Pung)। 'লেন' অর্থ জমায়েত হওয়া, 'পাং' শৈলভূমি। অর্থাৎ যে পাহাড়খণ্ডে লেপচারা জমায়েত হত। যে অর্থই বা উচ্চারণ হোক, এটা একটি লেপচা শব্দ। এই ভূখণ্ডটি ছিল মূলত লেপচাদেরই।

লেপচাদের এই প্রাধান্য খর্ব হতে শুরু করেছিল খাম্পাদের আগমনের পর। খাম্পা জনগোষ্ঠীর আদি নিবাস ছিল তিব্বতের খাম প্রদেশ। আজ এই খাম্পারাই ভুটিয়া বলে পরিচিত। এরা ছিল লেপচাদের থেকে বেশি শক্তিশালী। কৃতকৌশলেও ছিল লেপচাদের থেকে উন্নত। সে সময়ে লেপচাদের আদি ভূমি সিকিমের শাসনভার দখল করে তিব্বতীয় বংশজাত নামগিয়াল। লেপচাদের প্রাধান উপাস্য দেবতা ছিল পর্বত। কাঞ্চনজঙ্ঘা এদের আদি দেবতা। ভুটিয়াদের সঙ্গে সে সময় থেকেই লেপচাদের মধ্যে যে জাতিগত দ্বন্দ্ব ছিল, তার একটি ছিল শাসক ও শাসিতের দ্বন্দ্ব। আরেকটি ছিল লেপচাদের ভাষা, সংস্কৃতি ও ধর্মীয় বিশ্বাস ও তার আচরণের দ্বন্দ্ব। শাসক ভুটিয়াদের পৃষ্ঠপোষকতায় তিব্বতীয় বৌদ্ধ লামারা লেপচাদের অধিকাংশ শাসকের ধর্ম বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ করলেও, তারা তাদের আচরণ ও সংস্কৃতিকে পরিত্যাগ করে ভুটিয়াদের প্রতি পূর্ণ আনুগত্যকে মানতে চায়নি। ভুটিয়াদের সঙ্গে যেসব লেপচার বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপিত হয়েছিল, তারা অভিজাত লেপচা বলে স্বীকৃত হয়ে কাজি বলে পরিচিত হল।

অনেকের ধারণা, কালিম্পং ভুটানের অংশ ছিল। আসলে এটি ছিল সিকিমের অংশ। তখন এর নাম ছিল দালিংকোট বা ডামসাং। ১৭০৬ খ্রিস্টাব্দে ভুটান রাজা সিকিম রাজার দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে এই অংশটিকে তাঁর সাম্রাজ্যের সঙ্গে যুক্ত করেছিলেন। ১৮৬৫ সালের ১১ নভেম্বর ভুটানের সিঞ্চুলাতে ইংরেজ সরকারের সঙ্গে ভুটানের যে চুক্তি হয়, তাতে কালিম্পং-সহ বিশাল অংশ ইংরেজ সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হয়।

এই সময় থেকেই নেপাল থেকে দলে দলে নেপালি ভাষীরা দার্জিলিং পার্বত্য এলাকায় বসতি স্থাপন করতে শুরু করেছিল। শান্ত, নির্বিরোধী ও সহিষ্ণু লেপচা জনজাতি চারপাশ থেকে এই জনস্রোতের চাপে ক্রমশ সংখ্যালঘু নিজেদের অস্তিত্বকে টিকিয়ে রেখে চলেছিল। দীর্ঘদিন একত্রে বসবাস করতে করতে তারা নেপাল থেকে আগত বিভিন্ন জনগোষ্ঠীর মতো নিজেদের পাহাড়ি জনজাতি বলে ভাবতে শুরু করে পৃথক রাজ্য গঠনের দাবিকে সমর্থন জানিয়েছিল। যদিও নেপালি ভাষীদের প্রভুত্বকে অনেক লেপচাই মনে মনে যে মেনে নিতে পারছিল না, তাকে অস্বীকার করার জায়গা নেই। মুখ্যমন্ত্রী লেপচাদের এই সুপ্ত ক্ষোভকে ব্যবহার করতে লেপচা উন্নয়ন পরিষদ গঠন করলেন বটে, কিন্তু এর ফলে কালিম্পঙে নেপালি ভাবাবেগকে আবারও এক জোটে আনার রাস্তাটা খুলে দিলেন।

এখানেই কালিম্পঙের এই নির্বাচনের

ফলাফলের গুরুত্ব। পাহাড়ি জনজাতির পরিচয়ে ফাটল ধরাতে গিয়ে, সংখ্যাগরিষ্ঠ নেপালি ভাষীরা নিজেদের অবস্থানকে আরও দূর করার জাত্যভিমানের মানসিকতায় বিমল গুরুংদের বিরুদ্ধে তাদের ক্ষোভকে দূরে সরিয়ে রেখে, হরকাবাহাদুরের নেতৃত্বকে নেপালি জনজাতির প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা বলে মনে করছে কি না, তার একটা পরীক্ষা এ ক্ষেত্রে পাওয়া যাবে। পৃথক গোর্খাল্যান্ড রাজ্য দাবি আদায়ের যে প্রতিশ্রুতি দিয়ে বিমল গুরুংরা সুবাস ঘিসিঙের রাজত্বের অবসান ঘটিয়েছিলেন, সেই প্রতিশ্রুতি পূরণের ব্যর্থতা নেপালি ভাষীদের মনে নানা সন্দেহের দানা বাঁধতে শুরু করেছে। এর সঙ্গে যোগ হয়েছে সুবাস ঘিসিংদের মতো বিমল গুরুংদের বিরুদ্ধে নানা অভিযোগের ক্ষোভ। গোর্খা জনমুক্তি মোর্চার বিরোধী দলগুলিও জোটবদ্ধ হতে শুরু করেছিল। তবে মুখ্যমন্ত্রী এই জাতিসত্তার প্রশ্নে বিভাজনের যে রাজনীতি গ্রহণ করেছেন, তা নেপালি জাতিসত্তাকে ঐক্যবদ্ধ করে আবার বিমল গুরুংকেই তাদের নেতা বলে মেনে নিতে সাহায্য করবে কি না, তারই পরীক্ষা ঘটবে হরকাবাহাদুরের এই নির্বাচনের ফলের উপর।

প্রার্থী হিসেবে হরকাবাহাদুরের শিক্ষা ও যোগ্যতার প্রশ্নে কোনও সন্দেহ করার সুযোগ নেই। কিন্তু সমস্যা হচ্ছে পাহাড়ি জনসত্তা তথা আত্মনিয়ন্ত্রণের সমস্যা। এখানে বৃহত্তর জনগোষ্ঠীর প্রভুত্ববাদের বিরুদ্ধে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জনগোষ্ঠী যে একটা একাত্মবোধের পরিচয় গড়ে তোলে, তার প্রমাণ ঝাড়খণ্ড রাজ্য গঠন। এখানকার অধিবাসীরা তো সবাই সাঁওতাল নয়। এখানে আছে মুন্ডা, ঘারিয়া, ওরাওঁ ইত্যাদি অনেক জনগোষ্ঠী। এদের মিলিত মঞ্চ গড়ে উঠেছিল প্রবল সংখ্যাগরিষ্ঠ বিহারি জনগোষ্ঠীর প্রাধান্যের বিরুদ্ধে। আগামী দিনে এই ছোট ছোট জনগোষ্ঠী নিজেদের আত্মনিয়ন্ত্রণের দাবি নিয়ে এগিয়ে আসবে কি না তা এখনও বলার সময় আসেনি।

কালিম্পঙের নির্বাচনে হরকাবাহাদুরের প্রতিদ্বন্দ্বিতা এ ক্ষেত্রে একটা সূচকের কাজ করবে। প্রার্থী হরকাবাহাদুরের আছে জনপ্রিয়তা। তৃণমূল যদি প্রকাশ্যে তাঁকে এভাবে সমর্থন জানাতে এগিয়ে না এসে নীরবে সমর্থন জানাত, জনপ্রিয়তার দৌড়েই তিনি অনেক বেশি বিজয়ের পথে এগতে পারতেন বলে মনে হয়। কিন্তু তৃণমূলের ঘোষিত নীতি, কোনওভাবেই পৃথক গোর্খাল্যান্ডের দাবিকে মেনে নেওয়া হবে না— তার সহযাত্রী পরিচয় তাঁর বিজয়রথের এগবার পথে কিন্তু প্রচণ্ড বাধা হয়ে দাঁড়াবে। কারণ এখানের রাজনীতি জাতিসত্তার ভাবাবেগের স্রোতের রাজনীতি। তাই সে বাধা অতিক্রম করা অসম্ভব না হলেও অত্যন্ত কঠিন।

সৌমেন নাগ

‘তৃণমূল প্রার্থী হয়ে ভোটে দাঁড়ালে হেরে ভূত হতাম’

পাহাড়ে ভোটের হাওয়া কেমন?

হরকা- প্রচার জোরদার চলছে। পাহাড়ে আমি নতুন মুখ নই, কিন্তু আমার দল নতুন। বিরাট বড় এলাকা, হাতে সময় পেয়েছি খুব কম। রাস্তাঘাট খুব খারাপ, দূরদূরান্তে হেঁটেই পৌঁছে যাচ্ছি। এভাবেই প্রায় ৯০ ভাগ সেরে ফেলেছি।

কী বলে ভোট চাইছেন?

হরকা: উন্নয়ন। নতুন জেলায় নতুন রাস্তা, তার থেকে বেশি পানীয় জলের সুরাহা করতে হবে, ঢেলে সাজাতে হবে পরিকাঠামো।

মুখ্যমন্ত্রী তো আপনাকে তৃণমূলের প্রার্থী বলেই ঘোষণা করে দিলেন...

হরকা: উনি ভুল করেছেন বলে আমি সেই পথে পা বাড়াতে পারি না।

তাহলে তো আপনার দলটাই উঠে যাবে?

হরকা: দল ওঠার প্রশ্ন নয়। প্রশ্নটা বিশ্বাস আর আস্থার।

আপনার দল থেকে তো বহু কর্মী-সমর্থক ওই সময় বেরিয়ে গিয়েছেন?

হরকা: ভুল প্রচার। যে কারণে, উদ্দেশ্যে আর যাঁদের নিয়ে জন আন্দোলন পার্টি তৈরি হয়েছিল, তাঁরা প্রত্যেকেই এখনও দলের হয়ে কাজ করছেন।

কোন প্রতীকে লড়াই স্বস্তিদায়ক?

হরকা: আমি তৃণমূল প্রার্থী নই, আমার দল যেহেতু প্রতীক পাবে না, তাই আমি লড়ছি নির্দল প্রার্থী হয়ে ‘হুইস্‌ল’ চিহ্নে। তৃণমূল প্রার্থী হলে আমি হেরে ভূত হয়ে যেতাম।

আপনি তো শুধু তৃণমূল সমর্থক নন, মুখ্যমন্ত্রীরও খুব কাছের লোক?

হরকা: আমি পাহাড়ের কাছের লোক। আমারও কাছের লোক তাঁরাই।

তৃণমূল প্রার্থী হিসেবে নাম ঘোষণার পর বেশ কিছুদিন কলকাতায় ছিলেন...

হরকা: ওদের ভুলটা বোঝাতে হয়েছে।

মুখ্যমন্ত্রী পাহাড়ে প্রচার সেরে যাওয়ার পর আপনি শুরু করেছেন, তাতেই তো দেরি?

হরকা: না, ঠিক সেরকমটা নয়।

যে পাশান তামাংকে সামনে রেখে কালিম্পং জেলা করার আন্দোলন শুরু করেছিলেন, তিনি মোর্চায় ফিরে গেলেন কেন?

হরকা: এটা সম্পূর্ণই তাঁর ব্যাপার।

আরও তো অনেকেই দল ছেড়েছেন?

হরকা: সংখ্যাটা উল্লেখ করার মতো নয়।

নতুন দলের পক্ষে তো ক্ষতিকারক?

হরকা: যাঁদের আদর্শ বা বিশ্বাস আছে, তাঁদের দিয়েই দল চলবে।

আপনি তৃণমূল ছাড়া আর কাদের সমর্থন চাইছেন?

হরকা: মোর্চার সঙ্গে নেই যারা, তাদেরই। যাঁরা সরকারে থাকবেন, তাঁদের সমর্থন ছাড়া পাহাড়ে উন্নয়ন হবে কীভাবে?

পাহাড়বাসী শুধু উন্নয়নের কথাতেই চুপ থাকবে? আলাদা রাজ্য কিংবা গোর্খাল্যান্ড ভুলে যাবে?

হরকা: যেখানে পানীয় জল নেই, রাস্তাঘাট নেই, কোনও পরিকাঠামোই নেই— সেখানে আলাদা রাজ্য দিয়ে কী করবে? আগে তো এগুলো হোক।

প্রচারের সময় ভোটাররা পৃথক রাজ্যের প্রসঙ্গ তুলছেন?

হরকা: আমি তাদের উন্নয়নের কথাটাই বোঝাচ্ছি। ওটা না হলে আলাদা রাজ্য দিয়ে আর কী হবে।

তার মানে আলাদা রাজ্যের দাবিটা থাকছে, তা-ই তো?

হরকা: বললাম তো, সঠিক নেতৃত্ব দিয়ে পাহাড়ের উন্নয়ন ঘটাতে পারলেই কালিম্পং জেলা আদায়ের মতো পৃথক রাজ্যও হয়ে যাবে। আর সেটা সম্পূর্ণই কেন্দ্রের ব্যাপার। আপাতত আমি বিধায়ক, এর পর সংসদে যেতে হবে। পাহাড়ের উন্নয়নের দাবি আরও জোরদার করতে হবে।

তার মানে আপনি জিতছেন?

হরকা: ধরে নিন জিতে গিয়েছি।

সাক্ষাৎকার: **তপন মল্লিক চৌধুরী**

এখন ডুয়ার্স
এক্সক্লুসিভ

এবার কী রায় দিচ্ছে উত্তরের পাহাড় ও তরাই?

জয়ন্ত গুহ

পাহাড়ে পরিবর্তনের হাওয়া!

জমিদারি লম্ফঝম্প, রক্তচক্ষুর শাসন, লাগামছাড়া দাদাগিরি, জাতি বা ধর্মের অনর্গল প্রলাপ ভাষণ দিয়ে বেশি দিন ক্ষমতায় থাকা যায় না। এমনকি জাতিতত্ত্বের দোহাই দিয়ে বহু ইহুদি নিধন করেও ক্ষমতায় থাকতে পারেননি হিটলার। ২০১১-তে (মূলত) দক্ষিণবঙ্গে পরিবর্তন এসেছিল মমতার হাত ধরে। মানুষ সে দিন মমতাকে ভোট দিয়েছিল তাঁর অকুতোভয় চরিত্র এবং হার-না-মানা মানসিকতার জন্য। এবারে সেই তাঁর হাত ধরেই পাহাড়ে পরিবর্তনের হাওয়া। পাহাড়ের 'জমিদার' বিমল গুরুং ও তাঁর সাঙ্গোপাঙ্গরা বিলক্ষণ বুঝতে পারছেন সে কথা। হঠাৎ করে ওঁরা সবাই 'গুড বয়' হয়ে গিয়েছেন। জিজেএম-র পার্টি অফিসে এখন গান্ধিজির ছবি। গান্ধিজি হাসছেন। হাসারই কথা। শান্তিশৃঙ্খলা এসব তো অভিধানে ছিল না বিমল গুরুংদের। কার্শিয়াঙে ঢোকার মুখে যে রোহিণী বাংলো, ঘিসিঙের আমলে তৈরি, গুরুংরা সেই বাংলো ভাঙচুর করে আগুন লাগিয়ে দিয়েছিল— এখনও খণ্ডহর হয়ে পড়ে আছে। দিনের পর দিন যখন খুশি বন্‌ধ ডেকে, পাহাড়ের সাধারণ খেটে খাওয়া মানুষকে বিপদের মুখে ফেলে দিয়েছে মোর্চা। ২০১৪-র লোকসভা নির্বাচনের পর দার্জিলিং থেকে মানেভঞ্জন যাচ্ছিলাম যে গাড়িতে, সে গাড়ির ড্রাইভার রোহিত খাওয়াসকে জিজ্ঞেস করেছিলাম, এবার তো সব দিক থেকে ভাল হল। বিজেপি-মোর্চা একসঙ্গে পাহাড়ে। উত্তরে বেশ কিছুক্ষণ চুপ থেকে রোহিত বলেছিল, পাহাড় মে শান্তি চাহিয়ে, ঝুটমুট কা আন্দোলন নাহি। কেন? আন্দোলন কি খারাপ নাকি রোহিত?— আরে দাদা, এদের (মোর্চা) যখন টাকা ফুরিয়ে যায়, তখনই আন্দোলন করে। বন্‌ধ করে। তারপর ওদের পকেটে পয়সা আসে। আর আমার মতো গরিব মানুষের জন্য শুধুই হয়রানি। জানেন, আমার ছোট বাচ্চাটা অসুস্থ ছিল, কিন্তু মুখের দুধটুকুও এনে দিতে পারিনি এদের বন্‌ধের জন্য! হতভম্ব আমি অনেকক্ষণ চুপ থেকে প্রশ্ন করেছিলাম, গোর্খাল্যান্ড চাও না রোহিত?— নহি চাহিয়ে গোর্খাল্যান্ড। কেয়া

হ্যায় উস মে? পেট ভরেগা? মিলেগা রোটি-সবজি দো টাইম, পাহাড় কে সব লোগ কে লিয়ে?

২০১৫-র শুরুতে কোস্টারিকা থেকে গবেষক মার্লেন ভাসকোয়েজ এসেছিলেন পশ্চিমবঙ্গে। তাঁর গবেষণার বিষয়, ‘ডেমোক্রেসি অ্যান্ড কমিউনিস্ট পার্টি এশিয়া’। দার্জিলিঙে মানুষের সঙ্গে কথা বলতে বলতে তাঁর পরিচয় হয় সংহিতা রাইয়ের সঙ্গে। স্কুলে পড়ান। বাড়িতে নিয়ে গিয়ে কথা প্রসঙ্গে তিনি যখন মার্লেনকে বলছেন, ‘দক্ষিণপন্থী দল টিএমসি নেত্রী মমতা ব্যানার্জি ক্ষমতায় আসার পর এখানে পরিস্থিতি অনেক স্বাভাবিক হয়েছে। বামপন্থীরা ক্ষমতায় থাকাকালীন পাহাড়ে একে অপরের সঙ্গে ঝামেলা লাগিয়ে দেওয়া হত। প্রতিদিন হত খুনোখুনি। নির্বাচনে রিগিং ছিল স্বাভাবিক ঘটনা। পুলিশ-প্রশাসন ছিল নীরব। কমিউনিস্টরা পাহাড়ের শান্তি নষ্ট করেছে। শান্তি ফিরিয়েছে বাংলার মমতাদিদি।’ সব শুনে বন্ধু মার্লেনের চোখ ছানাবড়া। প্রতিক্রিয়ায় তিনি বলে উঠেছিলেন, ‘দিস ইজ কমপ্লিটলি ননসেন্স, ইট শুড বি চেঞ্জড।’ পরিবর্তনের শুরু হয়ে গিয়েছিল তার আগেই। হরকাবাহাদুরসহ আরও অনেকেই তখন মোর্চাসঙ্গ ত্যাগ করে পাহাড়ে নেপালি আধিপত্যের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাতে শুরু করলেন। ততদিনে জিএনএলএফ নেত্রী, ১৫ বছরের বিধায়ক, শান্তা ছেত্রী যোগ দিয়েছেন তৃণমূলে। আজ ২০১৬-তে পাহাড়ে মোর্চা বিরোধী জেএপি, এবিজিএল, জিএনএলএফ, ইউওয়াইএফ— সবাই পরিবর্তনে শামিল। ওদের পাশে তৃণমূলের সমর্থন। এবং পরিবর্তনপন্থীরা সবাই যার বিরুদ্ধে, সেই মোর্চাকে দু’হাত বাড়িয়ে সমর্থন জানিয়েছে সিপিএম। এই মোর্চাই ২০১৪ লোকসভায় বিজেপি-কে সমর্থন দিয়েছিল। সিপিএম-এর ভাষায় বিজেপি কিন্তু সেকুলার এবং সোশালিস্ট, কোনওটাই নয়। যদিও রাজনৈতিক সমীকরণে পাহাড়ে এক লাইনে সিপিএম, বিজেপি এবং মোর্চা।

রাস্তাঘাট, কাঠামোগত উন্নয়ন যদি না হয়, বন্‌ধের রাজনীতি, খুনোখুনি, দাদাগিরি যদি বন্ধ না হয়, তাহলে পাহাড়ে মোর্চা অনেকটাই ভেঙে গিয়েছে— আরও ভাঙবে। গোর্খাল্যান্ডের সেন্টিমেন্টকে সামনে রেখে না-উন্নয়নের খেলা বুঝে গিয়েছে পাহাড়ের মানুষ। কার্শিয়াং বিধানসভা কেন্দ্রের মোর্চা প্রার্থী বিচক্ষণ মানুষ। রোহিত শর্মাকে তাই ছুটে যেতে হয় সিটঙে, যেখানে রাস্তাঘাটের করুণ অবস্থা। মোর্চার দাবি, এসব রাস্তা করার দায়িত্ব রাজ্য সরকারের। ‘একদম মিথ্যে কথা। স্টেট হাইওয়ের দায়িত্ব রাজ্য সরকারের। পাহাড়ে প্রায় ৩০০ কিমি রাস্তা রক্ষণাবেক্ষণের দায় জিটিএ-র। রংবুক-সিটং-রিংটক সর্বত্র রাস্তা খুবই খারাপ। কিচ্ছু করেনি ওরা। রোহিণীর রাস্তা ডিজিএফসি-র আমলে তৈরি। জিটিএ রিপেয়ার করছে, কিন্তু টোল ট্যাক্স বসিয়ে দেদার আয় হচ্ছে। কোথায় যাচ্ছে? কী হচ্ছে এই টাকা? জনগণ এখন পাহাড়ের পরিবর্তন চাইছে।— প্রায় এক নিঃশ্বাসে কথাগুলো বলে থামলেন। এক সময় ঘিসিঙের কাছের মানুষ, ১৫ বছরের বিধায়ক, জিএনএলএফ নেত্রী (কার্শিয়াঙে), এখন তৃণমূল নেত্রী শান্তা ছেত্রী।

কার্শিয়াঙে ঢোকার মুখে ছোট্ট দোকান লেওয়াং গুরুঙের। অসাধারণ খাবার বানায় লেওয়াং। লুচি, ঘুগনি আর আলুর দম খেতে খেতে জিজ্ঞাসা করলাম, ভোটের আগে-পরে এবার ঝামেলা হবে না!— কেন দাদা?— না, পাহাড়ে তো মোর্চা এরকম করে।— এখন আর ওদের তেমন জোর নেই, কিচ্ছু হবে না।— মানে, পাহাড়ে তো মোর্চাই রাজা।— রাজা থা, লেকিন পাহাড় মে পরিবর্তন হোগা।— মানে, মোর্চা তাহলে সত্যি

KURSEONG
4864 Ft
KURSEONG
WBP TRAFFIC
WBP TRAFFIC

পাহাড়ের নিরুত্তাপ জীবন— ভোটের ফল নিয়ে আদৌ ভাবে না সাধারণ মানুষ।

জবুথবু?— হাসতে হাসতে লেওয়াং বলছে, এক চিজ বহুত দিন হো গ্যয়া, অভি টেস্ট চেঞ্জ করনা চাহতে হ্যায় পাহাড় কে লোগ।

কার্শিয়াঙে ঢুকে বিস্কুট কিনতে কিনতে দোকানদার রশিদকে জিজ্ঞাসা করলাম, হালচাল ক্যায়সা হ্যায়?— ইস টাইম মোর্চাকে লিয়ে জিতনা থোড়া কমপ্লিকেটেড হ্যায়। বহুত ফাইট হোগা।

হাসতে হাসতে যেভাবে রাস্তাঘাটে সবাই খুল্লমখুল্লা মতামত-ভাবনা শেয়ার করছে— এটা প্রায় অবিশ্বাস্য। ২০১১-তে কার্শিয়াঙে ভোটের আগে রিপোর্টিং-এ এসে দেখেছি, লোকজন সবাই মুখে কুলুপ এঁটে ঘোরাফেরা করছে। এবং আমাদের টিমকে সব সময়ের জন্য ঘিরে রেখেছিল বিমল গুরুঙের লোকজনরা।

ওই একই সময় কালিম্পঙে বিরোধী দলের কোনও অস্তিত্ব ছিল না। আমার গাড়ির সামনে-পিছনে মোর্চার গাড়ি। বিরোধীদের কোনও ফ্ল্যাগও চোখে পড়েনি আমার। ২০১৬-য় হরকাবাহাদুর ছেত্রীকে নিয়ে কালিম্পঙের উত্তেজনা চোখে পড়ার মতো। তার জনসভায় বৃষ্টি মাথায় নিয়েও লোকজনের ভিড়। বিমল গুরুং হুমকি দিয়েছিলেন, সাত দিন আমি কালিম্পঙে থাকব। দু'দিন না যেতেই দার্জিলিঙে পগারপার।

আসলে একটা বিষয় বোঝার সময় এসেছে। তোলাবাজি, দুর্নীতি, মিথ্যাচার মিডিয়ার দৌলতে মানুষের সামনে চলে আসছে। প্রাতিষ্ঠানিক মিডিয়ার বাইরে গণতন্ত্রে বিরাট ভূমিকা নিচ্ছে সোশাল মিডিয়া। দর্শন বা আবেগের মুলো ঝুলিয়ে কোনও দলই আর বেশি দিন ক্ষমতায় টিকে থাকতে পারবে না। দাদা হিসেবে নয়, জনগণের প্রতিনিধি হিসেবে

চলাফেরার রাস্তা এত খারাপ যে, সন্তানসম্ভবা অনেক মহিলা হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার পথে মারা যান। গোর্খাল্যান্ড ইস্যু এরকম গ্রামে কতটা গুরুত্বপূর্ণ? গ্রামবাসী সঞ্জু প্রধান জানায়, আগে চাই পৃথক জেলা কালিম্পং। তারপর গোর্খাল্যান্ড। এবং গোর্খাল্যান্ড আমরা সবসময়ই হরকাবাহাদুর ছেত্রীর পথে চাই। বন্‌ধ-মারদাঙ্গা করা বিমল গুরুংদের পথে নয়। কিন্তু পাহাড়ের ভিতরে যাতায়াতের রাস্তা মোর্চা বানাল না কেন? কেউ বাধা দিয়েছিল? মোর্চার দাবি, কেন্দ্র সরকার গত তিন বছরে ৬০০ কোটি টাকা দিলেও রাজ্য সরকার দিয়েছে ২০০ কোটি, দেওয়ার কথা ছিল ১০০০ কোটি টাকা। তাহলে ৮০০ কোটি না পাওয়ার গোসা, নাকি অন্য কোনও গল্প আছে?

নোটার পোস্টার: পাহাড়ের মানুষও আজ রাজনীতিতে বড় ক্লান্ত।

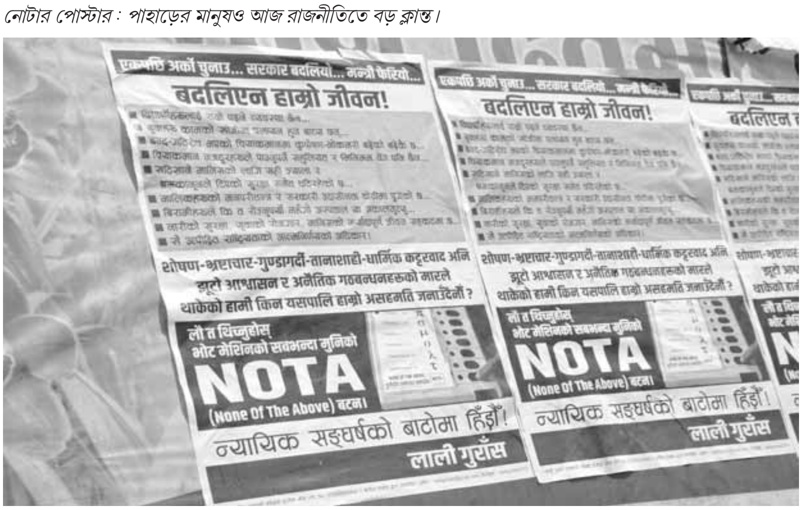
बदलिएन हाम्रो जीवन!
शोषण-भ्रष्टाचार-गुण्डागर्दी-तानाशाही-धार्मिक कट्टरवाद अनि झूटो आश्वासन र अनैतिक गठबन्धनहरूको मारले थाकेको हामी किन यसपालि हाम्रो असहमति जनाउँदैनौं?
लौ त चिन्नुहोस् भोट मेशिनको सबभन्दा मुनिको
NOTA
(None Of The Above) बटन।
न्यायिक सङ्घर्षको बाटोमा हिँडौं
लाली गुराँस

কাজ করতে হবে। নচেৎ সরে যেতে হবে। নির্বাচনের অনেক আগে থেকেই পাহাড়ের অনেক জায়গাতেই মানুষ বলে দিয়েছিল, রাস্তা না হলে ভোট দেব না।

কালিম্পঙের কাছেই কোলাখাম গ্রাম। ২-৩টি ইকো টুরিস্ট লজও হয়েছে। টুরিস্ট নিয়ে গাড়ি যত দূর যায়, তারপর আরও ৬ কিমি পায়ে হেঁটে নিচে নেমে যাওয়া যায় নদীর কাছাকাছি। মাঝে রয়েছে অসংখ্য ছোট ছোট গ্রাম। হাঁটা-পথে চোখে পড়ছে একটি স্কুল, একটি স্বাস্থ্যকেন্দ্র। দু'টিই তৈরি হয়েছে একটি জার্মান এনজিও-র দয়াদাক্ষিণ্যে। কোথাও কোনও পুলিশ স্টেশন নেই। চলাফেরার রাস্তা এত খারাপ যে, সন্তানসম্ভবা অনেক মহিলা হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার পথে মারা যান। গোর্খাল্যান্ড ইস্যু এরকম গ্রামে কতটা গুরুত্বপূর্ণ? গ্রামবাসী সঞ্জু প্রধান জানায়, আগে চাই পৃথক জেলা কালিম্পং। তারপর গোর্খাল্যান্ড। এবং গোর্খাল্যান্ড আমরা সবসময়ই হরকাবাহাদুর ছেত্রীর পথে চাই। বন্ধ-মারদাঙ্গা করা বিমল গুরুংদের পথে নয়।

गोरखाल्याण्डको
VOTE
FOR
GJM

আগের মতো লক্ষাধিক ভোটে জিতবেন নিশ্চিত দাবি, তবু সুর অনেক নরম মোর্চা নেতাদের।

কার্শিয়াং-এর চা-বাগানে প্রচারে শান্তা ছেত্রী।

কিন্তু পাহাড়ের ভিতরে যাতায়াতের রাস্তা মোর্চা বানাল না কেন? কেউ বাধা দিয়েছিল? মোর্চার দাবি, কেন্দ্র সরকার গত তিন বছরে ৬০০ কোটি টাকা দিলেও রাজ্য সরকার দিয়েছে ২০০ কোটি, দেওয়ার কথা ছিল ১০০০ কোটি টাকা।

তাহলে ৮০০ কোটি না পাওয়ার গোসা, নাকি অন্য কোনও গল্প আছে?

মোর্চার যুক্তি উড়িয়ে দিয়ে জিএনএলএফ থেকে তৃণমূলে আসা শান্তা ছেত্রীর দাবি, ঘিসিঙের আমলে রাজ্য সরকার কুড়িয়ে-বাড়িয়ে রেখে-ঢেকে ১৯ কোটি দিত। এখন তো মোর্চা অনেক টাকা পায়। কিন্তু কোনও উন্নয়ন করেনি ওরা। টাকা নয়-ছয় করেছে। লুট করেছে। এনএস-৫৫ রাস্তা ছ'বছর ধরে বন্ধ— কেন এতদিনেও রাস্তা খুলতে পারেনি ওরা? মানুষের ওপর কম অত্যাচার করেছে ওরা? জানেন, আমার ঘরে আগুন লাগিয়ে দিয়েছিল? আমার স্বামী যখন মারা যান, কাউকে আসতে দেয়নি আমার বাড়িতে।

নির্বাচনে কে জিতবে, কে হারবে, তার অনেক সমীকরণ থাকে। কিন্তু যে-ই জিতুক, পাহাড়কে সাজিয়ে তুলতে সময় দিতে হবে— একসঙ্গে, পাহাড়ের স্বার্থে। গোর্খাল্যান্ড ইস্যুতে একঘরে এখন মোর্চা। আর মোর্চার বিরুদ্ধে এক লাইনে চলে আসা জিএনএলএফ, জেএপি, এবিজিএল-সহ ছোটখাটো গণতান্ত্রিক ফোরামগুলি, পাহাড়ে উন্নয়ন ও মোর্চায় দুর্নীতির বিরুদ্ধে সরব আঞ্চলিক দল, সঙ্গে আছে তৃণমূলের সাপোর্ট। কিন্তু প্রায় সবাই তৃণমূলের সঙ্গে সমঝোতার প্রশ্নে ব্যালেন্সে খেলছে। যদিও একটা বিষয় অস্বীকার করার উপায় নেই যে, বিমল গুরুংদের একাধিপত্যে চিড় ধরিয়েছেন মমতা। মোর্চা ছাড়াও যে পাহাড়ে অন্যরকম সমীকরণ নিয়ে ভাবা যায়, সেটা মানুষ ভাবতে শুরু করেছে। মোর্চার ফতোয়া এখন আর পাহাড়ে কাজ করে না। পাহাড়ে ভয় ভেঙে দিয়েছে মমতার 'ডোন্ট কেয়ার' অ্যাটিচ্যুড। নির্বাচনের অঙ্ক যা-ই হোক না কেন, পাহাড়ে পরিবর্তন নিয়ে মমতার এক্সপেরিমেন্ট সফল। নির্বাচনের শেষে, ঠিক এখন থেকে শুরু হবে আসল খেলা— পরিবর্তনের পথচলা। তৃণমূল সমর্থিত বা তৃণমূলকে নিয়ে নতুন মোর্চার সম্ভাবনাও উড়িয়ে দেওয়া যাচ্ছে না। এক সময় পাহাড়ে ছিল সিপিএম-এর আধিপত্যই। তারপর ভূমিপুত্রদের মোর্চা স্টাইল মঞ্চ। এবার সেই মঞ্চে তৃণমূলের প্রবেশ। গোর্খাল্যান্ডের গজা ঝুলিয়ে উন্নয়নে হাত গুটিয়ে দাদাগিরির দিন শেষ। জিতুক, না জিতুক, পাহাড়ে মোর্চা এখন চাপে। পাহাড়ের উন্নয়নে দোষারোপের রাজনীতি বন্ধ করে সবার সঙ্গে মিলেমিশে কাজ করতে না পারলে, অদূর ভবিষ্যতে পাহাড়ে নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে, শত ভাগে ভেঙে টুকরো টুকরো হয়ে যাবে মোর্চার লাগামহীন একাধিপত্য।

শিলিগুড়িতে দূষিত মহানন্দা

এগারোর পরিবর্তন ঝড়েও তাঁর পরাজয় কিন্তু প্রত্যাশিত ছিল না। সেদিন কিঞ্চিৎ অবাক ভোটদাতাদের অনেকেই মুচকি হেসেছিলেন এই জননেতার জনগণ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাওয়ার অভাবনীয় পরিণাম দেখে। তারপর পাঁচ বছর সংশোধনের অক্লান্ত পরিশ্রমে ফর্মে ফিরেছেন তিনি, তাঁর রণকৌশল যাবতীয় প্রেরণার উৎস হয়ে দাঁড়ায় এরাজ্যের ক্ষীণকায় বিরোধী শক্তির কাছে, আর যাবতীয় অস্বস্তির মূল উৎস হয়ে দাঁড়ায় পশ্চিমবঙ্গের পরাক্রমশালী শাসকদলের কাছে। যদিও মেয়র হয়ে ‘প্রতিকূল’ পরিবেশে সুবিধা করে উঠতে পারেন নি তিনি, এবারের নির্বাচনে বিরোধী ‘খেলোয়াড়’ এক ইঞ্চি জমি ছেড়ে দেন নি তাঁকে, তবু শিলিগুড়ির ভোটারদের কাছে আজ জেতার চাইতেও বড় প্রশ্ন হল, এই বিশাল নগরীর জ্যাম-জট-জঞ্জাল হটিয়ে শেষ পর্যন্ত অপরাজিত থাকবেন তো অশোক ভট্টাচার্য?

অপরাজেয় অশোক!

‘হাততে চেরেন্দা লৈ, কুলালকুয়ারবাহির হৈ। যাই তর পনসা নদীর ঘাটে...’ কী, কিছু বুঝতে পারলেন? পারলেন না তো! না পারারই কথা। কামরূপী ভাষা কে-ই বা মনে রেখেছে! লোকসংগীত গায়ক রামেশ্বর ও ধনকা পাঠকের কথা মনে নেই আমাদের। ভুলে গিয়েছি আমরা। জীবনের স্রোতে আমরা কত কিছু ভুলে যাই। সেটাই জীবনের অঙ্গ। আর রাজনীতির রঙ্গ। বঙ্গজীবনের অঙ্গে অঙ্গে এখন হাত-হাতুড়ির রঙ্গলীলা।

রাহুল-বংশ-অধীর-সূর্য-বুদ্ধ-বিমানে নিরুপম তব প্রিয়দর্শিনী মহাত্মা-মার্কস— এখন আর তেলে-জলে নেই। মিলেমিশে এক্কেবারে তেল-কই। রঙ্গে রঙ্গে উথলি বঙ্গ হাত-হাতুড়ির যৌথ রঙ্গ— স্বপ্ন দেখছে পালাবদলের। অনেকটাই অলীক কল্পনা। কেননা গঙ্গার এপারে মানুষের বাম-এ আর টান নাই। ঝুঁকেছে ঘাসফুলে। কামরূপী ভাষার মতোই কংগ্রেসকে একেবারে ভুলে গিয়েছে মানুষ। কিন্তু গঙ্গাপারে মুর্শিদাবাদে এখনও কংগ্রেসের ‘অধীর’ বিচরণ। নদী পেরিয়ে গৌড়বঙ্গে কংগ্রেসের শক্ত ঘাঁটি এবং আরও উপরে উত্তরবঙ্গে তৃণমূল। সিপিএম-এর ভাগ্য নির্ভর করছে কংগ্রেসের উপর। এখানে অনুঘটকের ভূমিকায় কংগ্রেসের ভোট। ক্ষমতায় আসার মতো ভোট নেই, কিন্তু প্রতিদ্বন্দ্বীর সঙ্গে ব্যবধান বাড়াতে হাত ছাড়া গতি নেই।

তৃণমূল-ঝড়ে সিপিএম যখন পশ্চিমবঙ্গে প্রায় উধাও, তখন শিলিগুড়িতে অশোক ভট্টাচার্যর ‘সঙ্গে চলো হাত-হাতুড়ি’ মডেলে সিপিএম-এর বাজিমাত। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের গলার কাঁটা। অশোক মডেলে সনিয়া, ইয়েচুরি, কারাত, বিমান, বুদ্ধ— সব এক লাইনে হতেই উত্তরবঙ্গে কং-বাম-এর দমকা হাওয়া এবং শিলিগুড়িতে পালাবদলের ইঙ্গিত। অশোকের অনুরোধে দার্জিলিং, কালিম্পং, কার্শিয়াঙে জোটপ্রার্থী না দিয়ে সরাসরি তৃণমূলকে লড়িয়ে দেওয়ার মোক্ষম চাল। সব মিলিয়ে বহুদিন বাদে ‘ফ্যাসিস্ট শ্রেণিশত্রু’কে বন্ধু হিসেবে পেয়ে রীতিমতো বেতালের মতো সিপিএম চড়ে বসেছে কংগ্রেসের ঘাড়ে। বাম-ভূতকে পাশে পেয়ে কংগ্রেসও উত্তেজিত। যদিও উত্তরবঙ্গ ছাড়া হাত-হাতুড়ির ভূতনৃত্য আর কোথাও কার্যকরী হবে কি না তা নিয়ে প্রশ্ন আছে অনেক।

গলার কাঁটা তুলতে শিলিগুড়িতে বাইচুং বাজি

ডা. রুদ্রনাথ ভট্টাচার্য বা নান্টু পাল কেউ নয়, পাহাড়ি বিছে বাইচুংকে সামনে রেখে অশোক ম্যাজিক থামাতে চাইছে তৃণমূল। বাম-আমলে অশোক-বাইচুং নিবিড় সম্পর্কের কথা কারও অজানা নয়। লোকসভা ভোটে তৃণমূলের হয়ে দাঁড়িয়ে বাইচুঙের ভরাডুবি। শিলিগুড়ির ৩৫ শতাংশ অবাঙালি ভোট মুখ ঘুরিয়ে

নিয়েছিল লোকসভায়। কাজ দেয়নি বাইচুং ম্যাজিক। তাহলে? বাইচুংকে সামনে রেখে নির্বাচনী লড়াই কি আসলে মমতার অন্য কোনও কৌশল? বাইচুং কি আসলে আড়াই প্যাঁচের ঘোড়া?

শিলিগুড়ি পৌঁছানোর ট্রেন লেট করায় ট্রেনের মধ্যেই বসে পড়লাম জমাট আড্ডায়। ‘শিলিগুড়ির নেপালিরা, যারা বিমল গুরুংদের গোর্খাল্যান্ড সমর্থন করে, তারা বাইচুঙের খেলা ভালবাসলেও ভোট দেবে সিপিএম-কে। কেননা গোর্খাল্যান্ড আন্দোলনকে সমর্থন জানিয়েছে সিপিএম।’ শিলিগুলির তরুণ ব্যবসায়ী দিবস গুরুঙের এমনটাই মতামত। ওঁকে অবশ্য মনে করিয়ে দিলাম, ক্ষমতায় থাকতে সিপিএম কিন্তু গোর্খাল্যান্ড ইস্যুকে সমর্থন করেনি। দিবসের সাফ জবাব, ‘পলিটিক্স মে অ্যায়সা হোতা হি হ্যায়।’

চুপচাপ বসে আলোচনা শুনছিল বছর সাতাশের সুনন্দ মুখার্জি। শিলিগুড়ির বাসিন্দা। ‘যে-ই আসুক ক্ষমতায়, ট্রাফিক সমস্যার সমাধান করতে হবে। স্কুল টাইম বা অফিস টাইমে রাস্তা দিয়ে হাঁটা দায়। রাস্তা নেই অথচ হু হু করে গাড়ির পারমিট বেরচ্ছে রোজ। কে দিচ্ছে, কেন দিচ্ছে, বোঝা দায়!’ সুনন্দর কথা কেড়ে নিয়ে মুখ খুললেন বছর চল্লিশের রঞ্জন সাহা। ‘প্রতিদিন জনসংখ্যা বাড়ছে শিলিগুড়িতে। বাড়ছে গাড়ি, যানজট, আবর্জনা— অথচ চূড়ান্ত অবহেলায় মহানন্দা সংস্কার। এক সময়ের সুন্দর এক নদী, এখন দেখলে গা গুলিয়ে ওঠে।’

নিউ জলপাইগুড়ি স্টেশন থেকে বাবুপাড়া, গোশালা রোড ধরে হিলকার্ট রোড পেরিয়ে শিলিগুড়ি জংশন পর্যন্ত প্রায় সব দেওয়ালেই পাশাপাশি সিপিএম-তৃণমূলের প্রচার। বিজেপি-র দেওয়াল লিখন মাত্র একটি চোখে পড়েছে। ওরা বোধহয় দেওয়াল নয়, ডিজিটালে বিশ্বাসী। একটা ফ্ল্যাগও নেই কোথাও। যদিও তৃণমূল-সিপিএমের ফ্ল্যাগে ভরে আছে রাস্তা। গলি, দোকানপাট আর গৃহস্থের বাড়িঘর। দু’দলের পোস্টার, ফ্ল্যাগ, দেওয়াল লিখন একদম পাশাপাশি। গা ঘেঁষে। দেখতে দেখতে মনে হচ্ছিল, বাইচুং ভুটিয়া নয়, খোদ মমতা ব্যানার্জির প্রেস্টিজ ফাইট অশোক ভট্টাচার্যর বিরুদ্ধে। ২৯৪টি আসনের মধ্যে শিলিগুড়িতেই হবে সবচেয়ে বড় প্রেস্টিজ ফাইট। হাত-হাতুড়ি জোটে ইতিমধ্যেই অনেকটা এগিয়ে অশোকবাবু।

অশোক বা মমতা— কার চালে বাজিমাত হবে, দেখার অপক্ষোয় উত্তরবঙ্গসহ সমগ্র পশ্চিমবঙ্গ। শেষ কথা যদিও বলবে জনতা জনার্দন। তবে অশোক ভট্টাচার্য জিতলেও তাঁর দল সরকার তৈরি করতে না পারলে— অশোক উন্নয়নের গতি কোন মুখে ধাবিত হবে তা নিয়ে প্রশ্ন বড় সহজ নয়।

‘জোট ক্ষমতায় আসবে আমি ১০০ শতাংশ আত্মবিশ্বাসী’

প্রশ্ন: দেখা গেছে কংগ্রেসের ভোট সবসময়ই শিলিগুড়িতে ব্যবধান তৈরিতে সাহায্য করে, এবারও কি তাই?

অশোক ভট্টাচার্য: একেবারেই না। ২০০৬-এ তো কংগ্রেসের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়েছিলাম নির্বাচনে। ৭৫,০০০ ভোটে জিতেছিলাম।

প্রশ্ন: কিন্তু ২০১১-তে হারলেন কীভাবে? কংগ্রেস আর নেপালি ভোট তৃণমূলে গিয়েছিল বলে?

অশোক ভট্টাচার্য: না না। হাওয়া ছিল একটা। মিডিয়া মানুষকে বিভ্রান্ত করেছিল এবং ইন্ডাস্ট্রিয়ালাইজেশন নিয়ে আমাদের পথ আমরা মানুষকে বোঝাতে ব্যর্থ হয়েছিলাম। কিন্তু যা-ই হোক, আমি হেরেছিলাম।

প্রশ্ন: অধীর চৌধুরীর সঙ্গে আপনার একটা মিল আছে— (কপালে ভাঁজ পড়ল অশোকবাবুর) অধীর যেমন মুর্শিদাবাদ ছেড়ে কোথাও বেরন না, তেমনি আপনিও শিলিগুড়ি ছাড়া বেরনও না, ভাবেনও না।

অশোক ভট্টাচার্য: এটা ঠিক নয়। এই তো, কালকেই আমি বেলাকোবা যাব। আসলে আমাদের পার্টি একটু অন্যরকম। তা ছাড়া মেয়র হবার পর আমাকে শিলিগুড়িতে সময় বেশি দিতে হচ্ছে। (যদিও আসল প্রশ্নটা ডজ করে বেরিয়ে গেলেন।)

প্রশ্ন: নিঃসন্দেহে আপনি অনেক কাজ করেছেন। শিলিগুড়ি-জলপাইগুড়ি উন্নয়ন পর্ষদ করেছেন। মালকে অন্তর্ভুক্ত করেছেন। অথচ কোচবিহার-আলিপুরদুয়ারের কথা ভাবলেন না?

অশোক ভট্টাচার্য: জয়গাঁও উন্নয়ন পর্ষদে আলিপুরদুয়ারকে অন্তর্ভুক্ত করার পরিকল্পনা ছিল, কিন্তু পারিনি। হেরে গেলাম বিধানসভায়। আর কোচবিহারে তখন কংগ্রেস। তাদেরকে টপকে কিছু করা সম্ভব ছিল না। যদিও সামগ্রিকভাবে উন্নয়নের কাজ হয়েছে রাজ্য সরকারের তরফে।

প্রশ্ন: এবারের বিধানসভা নির্বাচনে বিজেপি-ও একটা ফ্যাক্টর শিলিগুড়িতে।

অশোক ভট্টাচার্য: ধুস। কোনও ফ্যাক্টরই মনে করছি না। বেলুন চুপসে গিয়েছে।

প্রশ্ন: বাইচুং?

অশোক ভট্টাচার্য: ভাল ফুটবলার। ভাল ছেলে। কিন্তু পলিটিক্যালি... (স্মিত হাসলেন)। আত্মসন্তুষ্টি নেই, কিন্তু আমার রেজাল্ট নিয়ে আমি আত্মবিশ্বাসী।

প্রশ্ন: জিতলে উন্নয়নের কাজ কী করে করবেন? সরকার তো তৃণমূলের হবে।

অশোক ভট্টাচার্য: আমি ১০০ শতাংশ আত্মবিশ্বাসী, বাম-জোট ক্ষমতায় আসবে। বিধায়ক হিসেবে আমি আমার কাজ করে যাব।

ভয় মুক্ত বাংলা চাই
দিলীপ সিং

কীসের ভয় পাচ্ছে এতদিনের দোর্দণ্ডপ্রতাপ সিপিএম?

তরাইয়ে কংগ্রেসি ক্ষীরের মালপোয়ার দিকে তাকিয়ে আছে দু’পক্ষই

বহু রক্তপাত শেষে রাজা অশোক গৌতম (বুদ্ধ) বাণীতে মাথা নত করেছিলেন। হাজার বছর বাদে ঘাসফুলের দাপুটে সাম্রাজ্যে, শিলিগুড়ির অশোকের কাছে, সামান্য মিউনিসিপ্যাল নির্বাচনে গৌতম (দেব)-এর নিঃশব্দ নতিস্বীকার। সেই স্মৃতি ম্লান হওয়ার আগেই ২০১৬ বিধানসভা নির্বাচন। শিলিগুড়ি লাগোয়া ডাবগ্রাম-ফুলবাড়ি বিধানসভায় তৃণমূল প্রার্থী গৌতম দেব। কং-বাম জোটের ডাকে সিপিএম শিবিরে বাড়তি উৎসাহের হাওয়া। অভিযোগ, পালটা অভিযোগের চাপানউতোরে টানটান ভোটবাজার। সিপিএম-এর স্লোগান, ‘ভয়মুক্ত বাংলা চাই।’ তৃণমূলের নিশানা ‘উন্নয়নে’। কং-বাম জোটের সিপিএম প্রার্থী দিলীপ সিং-এর দাবি, এলাকায় তাণ্ডব চালিয়েছে তৃণমূল বাহিনী। পার্টি অফিস ভেঙে দিয়েছে। প্রকাশ্যে রাস্তায় তোলা তুলেছে। উন্নয়নের নামে টাকা কামিয়েছে তৃণমূল নেতারা।

সিপিএম-এর অভিযোগ ফুৎকারে উড়িয়ে গৌতম দেবের ছায়াসঙ্গী (ব্লক তৃণমূল কংগ্রেস কমিটির সভাপতি) দেবাশিস প্রামাণিকের দাবি, ১ পার্সেন্ট করে নিলেও গৌতম দেব এতদিনে বহু কোটি কামাতে পারতেন, সে ক্ষেত্রে বিরোধীরা নিশ্চয়ই ছেড়ে দিতেন না। যদি সত্যিই গৌতম দেব কোটি কোটি কামিয়ে থাকেন তাহলে তদন্ত হোক। দিনের আলোর মতো পরিষ্কার হয়ে যাবে সব।

কিন্তু জিততে কি পারবেন গৌতম? ২০১১ লোকসভায় দিলীপ সিং-এর চেয়ে মাত্র ১১,২৮৫ ভোটে এগিয়ে ছিলেন। জিতলেও লড়াই ছিল টানটান। গত বিধানসভার ঘাসফুল হাওয়ায় গৌতম দেবের এই ভোটের মার্জিন এমন কিছু বেশি নয়। ২০১৪-র লোকসভা নির্বাচনে এই এলাকা থেকে ১৮,০০০ ভোটে সিপিএম-এর থেকে এগিয়ে থাকলেও বিজেপি-র ভোট ছিল ৫০,০০০-এর উপর। আর কংগ্রেসের ভোট ছিল ৯,২০০। লোকসভার বিজেপি ভোট যদি বিধানসভায় কংগ্রেসের ঘরে আসে তাহলে নিশ্চিত বিপদে পড়তে চলেছে ঘাসফুল ও গৌতম। লড়াইটা যে খুব মসৃণ নয়, সেটা অনেক আগেই বুঝে ফেলেছিলেন এলাকায় তৃণমূল নেতৃত্ব। না হলে পার্টি ক্লাস-এর উদ্যোগ তৃণমূল কংগ্রেসের তরফে কোথাও হয়, এমনটা অবিশ্বাস্য। ২০১৫-র নভেম্বরে এলাকায় নিয়ম করে পার্টি ক্লাস শুরু করে দিয়েছিল তৃণমূল। কেননা একটা জিনিস প্রাক্তন কংগ্রেস সংগঠক গৌতমের কাছে পরিষ্কার ছিল, সংগঠন ছাড়া শুধু উন্নয়ন দিয়ে নির্বাচনে জেতা যায় না। ২০১৩ সালের পঞ্চায়েত নির্বাচনে এই এলাকার ৮২টি পঞ্চায়েত সিটের মধ্যে ঘাসফুলের ছিল ৩২টি। পরবর্তীকালে কংগ্রেসিরা তৃণমূলে যোগ দেওয়ায় ৫৬টি সিট দখলে আসে তৃণমূলের। এলাকার ৪টি গ্রাম পঞ্চায়েতও এখন তাদের দখলে। যদিও পয়সা ছড়িয়ে নির্বাচিত প্রতিনিধি বেচাকেনার অভিযোগ দিলীপ সিং ঘনিষ্ঠ সিপিএম নেতা অসীম সাহার। প্রায় ২ লাখ ভোটারের ডাবগ্রাম-ফুলবাড়ি বিধানসভায় সিপিএম ফিরে আসবেই বলে দাবি অসীমের। এমন মনের জোর তৈরি হতে শুরু হয়েছিল শিলিগুড়ি পুরসভা নির্বাচনের সময় থেকেই। ডাবগ্রাম-ফুলবাড়ির ৩১, ৩২, ৩৩, ৩৪, ৩৫ শিলিগুড়ি পুরসভার অন্তর্গত, যেখান থেকে (৩৫ বাদে) সিপিএম ২৭৮৭টি ভোট পেয়েছিল পুরসভা নির্বাচনে। যদিও চারটি ওয়ার্ডেই হেরে গিয়েছিল ২০১১ বিধানসভায়। ৫০০০ ভোটের লিড দেবে এই চার ওয়ার্ড। এমনটাই প্রত্যাশা সিপিএমের। কিন্তু গৌতম দেবের উন্নয়নের জোয়ারে সব ভেসে যাবে না তো! মহম্মদ সেলিম, বিকাশ ভট্টাচার্য, মানব মুখার্জিদের যুক্তি— ওসব কসমেটিক্স ডেভেলপমেন্ট।

লড়াইটা যে মসৃণ নয় সে কথা এতদিনে নিশ্চয় বুঝে গিয়েছেন গৌতম দেব।

বেসিক উন্নয়ন কিছু হয়নি। মানবসম্পদ উন্নয়ন না হলে সেটা আবার উন্নয়ন নাকি? কলেজ, হাসপাতাল, শিল্প— কিছুই না করে গ্রাম-শহরের ক্লাবে ক্লাবে টাকা ঢেলে উন্নয়নের নামে ছেলেখেলা হচ্ছে। পালটা জবাবে গৌতম দেব শিবিরের লম্বা ফিরিস্তি, এবং তাকে ছেলেখেলা বলে উড়িয়ে দেওয়া মুশকিল আছে। উন্নয়নের দীর্ঘ লিস্টে আছে শান্তিনগরে ভূগর্ভস্থ নিকাশি ব্যবস্থা, নদীর উপর ১৪টি পাকা সেতু নির্মাণ, দমকল কেন্দ্র, জমি রেজিস্ট্রি অফিস, বেঙ্গল সাফারি পার্ক, বৈদ্যুতিক চুল্লি এবং বিভিন্ন সড়ক ও সেচ বাঁধ নির্মাণ।

ফিরিস্তি দিয়েও স্বস্তি নেই তৃণমূলে। বিভিন্ন এলাকায় ছোট ছোট গ্রুপ মিটিং ও সভা নিয়ে ব্যস্ত। সিপিএম-এরও মিছিল বেরিয়েছে। কিন্তু ঘাসফুলের দাবি, ওরা বাইরে থেকে লোক এনেছে। মানুষ রয়েছে আমাদের সঙ্গে। ব্লক তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি দেবাশিস প্রামাণিকের দাবি, ১১,০০০ ভোটে আমরা জিতবই। প্রত্যাশা ২২,০০০, কিন্তু ৩৩,০০০ হলেও অবাক হব না। কারণ তৃণমূলের বুথ লেভেল এজেন্টদের উদ্যোগেই ৩৭,০০০ নতুন ভোটদাতার নাম তালিকায় উঠেছে, এদের অন্তত অর্ধেক ভোট তো এবার আশাই করতে পারেন তাঁরা।

সিপিএমের দাবি, ১০,০০০-এ জিতবই। কিন্তু চেষ্টা আমাদের ২০,০০০-এর মার্জিন তৈরির। এবং সে ক্ষেত্রে সিপিএমের আশা, বাম-কং জোটের সিপিএম প্রার্থীকে ঢেলে ভোট দেবে কংগ্রেস। তৃণমূল বলছে, আরে দূর, কংগ্রেস কোথায়! এখানে সব তৃণমূল হয়ে গিয়েছে। তবে যেটুকু এখনও বেঁচে সেই ৮-১০ হাজার কংগ্রেসি ভোটে দু'দলেরই তীব্র লোভ। অদম্য আকাঙ্ক্ষা, কে পাবে সেই ক্ষীরের মালপোয়া, কেউ জানে না। কিন্তু যে পাবে, সে-ই রাজা। সিপিএম-এর যুক্তি, তৃণমূলকে হটাতে মানুষের জোটের সমর্থনে প্রত্যেকটি কংগ্রেসি ভোট পড়বে দিলীপ সিং-এর দিকে। হাসতে হাসতে তৃণমূলিরা বলছে, কংগ্রেসকে অত্যাচার করছে সিপিএম। কিন্তু উত্তরবঙ্গে তৃণমূলের সঙ্গে কংগ্রেসের কোনও বিবাদ নেই। স্বাভাবিকভাবেই কংগ্রেসিদের ভোট পড়বে তৃণমূলের দিকে। কং-বাম জোটকে কংগ্রেসিরা কখনওই মেনে নিতে পারবে না। কং-বাম জোট কার্যকরী হবে কি না? হলেও তাতে সিপিএম প্রার্থীরা কতটা সুবিধা পাবে? প্রাক্তন কংগ্রেসি থেকে তৃণমূলি হওয়া নেতাদের কংগ্রেসিরা বিশ্বাস করবে, নাকি হালফিলের 'মানুষের জোটে'ই তাদের বেশি আস্থা? নির্বাচনের পরে কতদিন থাকবে এই জোট? আদৌ থাকবে তো? অস্তিত্ব বাঁচাতে সম্মানজনক কোনও দূরত্বে থেকে কংগ্রেস-তৃণমূল এবং সিপিএম-এর শরিকদের নতুন কোনও সমীকরণ তৈরি হতে পারে কি?— এসব প্রশ্নের উত্তর এখনও আরামে ঘুমাচ্ছে গঙ্গার বিশ বাঁও জলে। কখন যে ভুউউশ করে ভেসে উঠবে, জানে না কেউ। কিন্তু সে দিন আর বেশি দেরি নেই। আপাতত ক্ষীরের মালপোয়া খাওয়ার সময়। আকাশে ঝুলিতেছে। সবাই ইয়াব্বড় হাঁ করিয়ে আছে। টুপটাপ করিয়া আশা-আকাঙ্ক্ষার রস ঝরিয়া পড়ে। আর তাতেই হইহই পড়িয়া যায়। এই তো পাইলাম— পাইবেই ম্যাজিক নাম্বার। কিন্তু কংগ্রেসি ক্ষীরের মালপোয়া বড় অবাধ্য। নামিব, নামিলাম করিলেও সে আকাশে ঝুলিয়া আছে— রহস্যময় মহাজাগতিক যানের মতো। কবে নামিবে, কার পাতে পড়িবে— উত্তর মেলে না, কিন্তু কিছু একটা হইবেই। এই আশাতে সবাই পাত পাড়িয়া ঊর্ধ্ববাহু হইয়া বসিয়া আছে আর সমানে ডাকিতেছে, আয় আয় আয় কংগ্রেসি মালপোয়া— বাবু আমার— সোনা আমার— আমার আদরের ধন— মানিক— রাজা করিয়া রাখিব তোরে— সহস্র চুম্বনে ভরাইয়া দিব মনপ্রাণ— আয় আয় আয়।

ডুয়ার্সের হাজার কবিতা

এখন ডুয়ার্স-এর উদ্যোগে এরকমই একটি অভূতপূর্ব সংকলন প্রকাশিত হবে আগামী জুন মাসে। এই অঞ্চলের খ্যাত-অখ্যাত কবিদের নিজস্ব বাছাই কবিতাগুচ্ছ থাকছে এই সংকলনে। স্বভাবতই কলেবরে আয়তনে দশাসই হবে বলাই বাহুল্য। ডুয়ার্সের যাঁরা কবিতা লিখছেন তাঁদের সবার কাছে আহ্বান রইল এই সংকলনে কবিতা সহ যোগ দেওয়ার। কবিতায় ডুয়ার্স ভূখণ্ডের উপস্থিতি কাম্য। প্রত্যেকে তাঁর সেরা কুড়িটি কবিতা (প্রকাশিত বা অপ্রকাশিত) বাছাই করে টাইপ করে পিডিএফ ফরম্যাটে মেল করুন ekhonduars.sahitya@gmail.com কিংবা হাতে বা ডাকযোগে হলে পাঠান 'এখন ডুয়ার্স'-এর ডুয়ার্স ব্যুরো অফিসে। (মুক্তাভবন। মার্চেন্ট রোড। জলপাইগুড়ি) আরও কিছু জানতে চাইলে ফোন করুন অমিতকে (৯৬৪৭৭৮০৭৯২) বা শুভ্রকে (৯৪৭৫৫০৩৩৪৮)।

কবিতা পাঠাবার শেষ তারিখ মে ১৫, ২০১৬।

বনের বাইরে বন সাফারি

জলদাপাড়া জঙ্গলের কথা মনে হলেই চক্ষুপটে ভেসে ওঠে গন্ডার, হাতি, গাউর, ময়ূর, শত শত ময়না, বুলবুলি, ছাতারে, নীলকণ্ঠ, আরও কত দুর্লভ প্রজাতির কীটপতঙ্গ, প্রজাপতি, নদীনালা-ঝোরা-খোলা। সব মিলিয়ে অসাধারণ আরণ্যক সৌন্দর্য। দেশ-বিদেশের পর্যটকরা জলদাপাড়াতে আসেন মাপা ছকের মধ্যে। হলং লজে ভাগ্যবানরা থাকেন। ভালমন্দ খানাপিনা, জানালা থেকে গন্ডার দর্শন, হরিণডাঙা, নজরমিনারে উঠে দাপাদাপি, ক্লিক ক্লিক। ভোরে কিংবা বিকেলে হস্তীপৃষ্ঠে অথবা হুড খোলা জিপে বন্য প্রাণী দর্শন। তারপর কেউ যান খয়েরবাড়ি লেপার্ড সাফারিতে কুঞ্জনগরে। কিছু না দেখতে পেলে ক্ষিপ্ত হয়ে শাপশাপান্ত— ফালতু, বেকার আসা, গন্ডারগুলো গেল কোথায়? খোঁজ নাও— এইসব। কিন্তু বনের বাইরে বন সাফারির খবর রাখেন ক'জন? মাদারিহাটের অরণ্যপ্রেমী অবনী দাসের আবিষ্কার, রূপকারও বলা যায়। বনপথের পাঁচালিতে তিনিই ছিলেন অরণ্যপথের সঙ্গী, পথপ্রদর্শক। হালকা শীতের ওড়না গায়ে সস্ত্রীক বেরিয়ে পড়ি অবনীবাবুর আমন্ত্রণে। সকাল সাড়ে দশটায় মাদারিহাট স্টেশনে নেমে ইতিউতি তাকাতেই দেখি পুচকি গাড়ি নিয়ে আমাদের অপেক্ষায়। সটান মাদারিহাট থানার উলটো দিকে জলদাপাড়া ফ্যামিলি টুরিজম সেন্টারে। রাঙালিবাজনা স্কুলের বেণু মহারাজের 'বিনিদ্র' পত্রিকায় প্রকাশিত বিজ্ঞাপন উডহাউস দেখে যোগাযোগ। হলং, মাদারিহাট টুরিস্ট লজের মতো হাইফাই না হলেও মন্দ নয়, চলনসই। ধর্মশালাও রয়েছে। মাদারিহাটে এখন ব্যক্তিগত উদ্যোগে থাকা-খাওয়া, বেড়ানোর জন্য জিপ-ট্যাক্সি যাবতীয় সবই মেলে। স্টেশনে যদি গুটিকয় রিটায়ারিং রুম রেল দপ্তর তৈরি করে, পর্যটকদের সুবিধা হত। কাঞ্চনকন্যা দু'মিনিট স্টপেজ দিলে রেলের লাভই হত। রেল মন্ত্রীর কাছে বিনম্র নিবেদন, প্রস্তাবটি ভেবে দেখুন। জলদাপাড়া বেড়াতে ইচ্ছুক পর্যটকরা ট্রেনে চেপে সরাসরি মাদারিহাট নেমে রিকশায় টুরিস্ট লজ বা অন্যত্র পৌঁছে যাবে। হলং যেতে অবশ্য চারচাকা প্রয়োজন।

সঞ্জয়, গৌতমরা সাদরে লাগেজ উপরে নিয়ে গেল। প্রভূত পরিশ্রম, অর্থব্যয়, কঠিন চ্যালেঞ্জ এই উডহাউসকে দাঁড় করানো। এখনও কাজকর্ম অনেক বাকি। রাজনীতির ডামাডোলে এ বছর ডুয়ার্সে অনেকে আসতে ইতস্তত করছেন। মাদারিহাটে ওসব ঝুটঝামেলা কিছু নেই। লজের পিছনেই রেল লাইন। রেলের বাঁশি, নীল কামরা দুরন্ত গতিতে যখন ছুটে চলে, লজের দোতলা তখন দোলে। ভারী মজার। সম্মুখ দিয়েই পণ্য বোঝাই লরি, যাত্রী বোঝাই বাস, ট্যাক্সি, জিপের অবিরাম ছোটাছুটি। শব্দ দূষণে অভয়ারণ্যের দফারফা। মাঝে মাঝে হাসিমারা বায়ুসেনার বিমানের শব্দে, বন্য প্রাণীরা দিশেহারা হয়ে ছুটতে থাকে। এ দৃশ্য আমি দেখেছি শিলতোর্সা নজরমিনারে দাঁড়িয়ে। চা-বিস্কুট খেতে খেতেই অবনীবাবুর আবির্ভাব। প্রাথমিক পরিচয়। মিতভাষী, নম্র ব্যবহার। বললেন, 'কথাবার্তা গাড়িতে যেতে যেতে হবে। আপনারা স্নান-খাওয়া সেরে নিন। আমি আসছি।' বেলা বারোটার মধ্যে পুচকি জিপ নিয়ে চলে এল। গিন্নির প্রশ্ন, 'আমরা যাচ্ছি কোথায়?' 'বনের বাইরে বন সাফারিতে।' 'সে আবার কী?' 'এইমাত্র অবনীবাবু এসে জানিয়ে গিয়েছেন। বেশি কথা নয়, শীতের দুপুর ফুড়ুৎ করে পালিয়ে যাবে। অতএব রেডি হয়ে নাও।'

পথপ্রদর্শক অবনী দাস। পথঘাট, বেড়ানোর হালফিল তাঁর হাতের তালুতে। মাদারিহাট-বীরপাড়া পঞ্চায়েত সমিতির প্রাক্তন সভাপতি। রাজনীতির জটিল জ্যামিতি,

কূটকচালি থেকে মুক্ত। কর্মজীবনে গ্রামের উন্নতি, বনভূমি, চা-বাগান, শ্রমিকদের সেবা ইত্যাদি করার ফাঁকে মনে হত, বনের বাইরে বন সাফারি, আদিবাসী সমাজ-সংস্কৃতি যদি বিশ্বের পর্যটকদের সামনে তুলে ধরা যায়, তো কেমন হয়? ২০০৭ সালে শীতের মিষ্টি রোদ্দুরে মাদারিহাটের টুরিস্ট লজের পাশে থানার পিছনে সবার শুভেচ্ছা নিয়ে উদ্‌বোধন হল। একঝাঁক বিশিষ্ট সম্মানিত ব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন। শ্রীমতী কুমারী কুজুর, বন মন্ত্রী অনন্তবাবু, অনগ্রসর, সম্প্রদায় কল্যাণ দপ্তরের যোগেশবাবু, বনাধিকারিক মণীন্দ্রবাবু এবং আরও অনেকে। খবরের কাগজে নানাজনের লেখাপত্রে সমৃদ্ধ হলেও দুর্ভাগ্য, অবনীবাবুর স্বপ্ন মনে হয় বাস্তবে পরিণত হয়নি, অধরাই থেকে গিয়েছে। কারণ অনুসন্ধান, বিশ্লেষণ করে লাভ নেই। সরকারি-বেসরকারি ভ্রমণ সংস্থা এ বিষয়ে নিরুৎসাহী কিংবা তেমন জোরদার প্রচার হয় না। কলকাতার ভ্রমণ সংস্থাগুলি খবরই রাখে না। গাড়িতে তাঁর তৈরি কিছু ছাপানো কাগজপত্র দিলেন, যদি কাজে লাগে।

রেলপথ টপকে লোকালয়, দোকানপাট চোখে পড়ল। মাদারিহাট-টোটোপাড়ার পথ। শিবালয় গেস্ট হাউস। সাইনবোর্ডে ঝুলছে— জলদাপাড়া ভ্রমণে থাকুন আরামে স্বাচ্ছন্দ্যে। এবড়োখেবড়ো পথ ধুলোয় অন্ধকার। বালি-বজরির ট্রাক পাশ কাটিয়ে গেল। পৌঁছে গেলাম সবুজ চায়ের দেশে। একদিকে হান্টাপাড়া, গ্যারগান্ডা, অন্য দিকে রামঝোরা, গোপালপুর, দলমোর, বীরপাড়া চা-বাগান, জঙ্গল, নদী, পাহাড়, আদিবাসী জনজাতিদের ঘরবাড়ি।

আমি এই জায়গাটার নামকরণ করেছি ‘হান্টাপাড়া নির্জন পার্ক। কলকাতা থেকে অনেক ভ্রমণপিপাসুকে এখানে এনেছি। সবাই একবাক্যে বলেছেন, ‘জবাব নেই’, ‘ফাটাফাটি’, ‘এক্সিলেন্ট’।’ ফুল্ল জ্যোৎস্নায় নির্জন পার্কে এলে মনে হবে স্বার্গীয় আনন্দে ভেসে চলেছেন অতীন্দ্রিয় জগতে। হান্টাপাড়া চা-বাগান কর্তৃপক্ষ চা-পর্যটন নিয়ে ভাবনাচিন্তা করলে ভাল হয়। এর পর দ্বিতীয় আবিষ্কার লঙ্কাপাড়া চা-বাগান সংলগ্ন খাড়া পাহাড়। জঙ্গলের মাঝে গাড়ি রেখে আমরা নদীর বুকে রাশি রাশি রংবেরঙের পাথর, তিরতির জল ছুঁয়ে পাহাড়ের কাছে যাই। ডুয়ার্সের ডিমা, বালা, বসরা নদীতে দাঁড়ালে একই অনুভূতি হয়। ভুটানের ঘরবাড়ি, লোকজন স্পষ্ট দেখা যায়। জায়গাটি বিশাল এবং ভয়ংকর নির্জন। সুবিশাল নদী বহু দূর পর্যন্ত ব্যাপ্ত। বর্ষায় এভাবে নদীর মাঝখানে দাঁড়ানো অসম্ভব। গিন্নির ভয় হাতি। অবনীবাবুর উত্তর, ‘হাতিরা মানুষের চেয়ে ভদ্র, সভ্য, বিনয়ী। আমরা জন্তুজানোয়ার, পশুর চেয়েও অধম। চলুন এগিয়ে যাই।’

চা-বাগান, জঙ্গল, নদী, পাহাড়ের গা ঘেঁষে পৌঁছাই লঙ্কাপাড়া চা-বাগানের হাটতলায়। কেনাবেচার ভিড়। আদিবাসী, বাঙালি, বিহারি, নেপালি নানা ভাষাভাষীর মানুষজন। হাটুরেদের দল হাটে নানা পণ্য সাজিয়ে বসেছে। ইচ্ছে করছিল ভুইত্যা কলা কেনা। ভিড়ের ঠেলায় গাড়ি নিয়ে এগনো দুঃসাধ্য। কোনওমতে হাটের হট্টগোল, গোলকধাঁধা থেকে বেরিয়ে লঙ্কাপাড়া চা-বাগানের ভিতরে ঢুকি। খুঁজে বেড়াই সঞ্জয়কে। সহকারী ম্যানেজার। চা-পাতি কারখানার গেটে দাঁড়ানো এক ব্যক্তি বলে, ‘সাহেব বাংলো মে হ্যায়।’ ঘুরপাক খেতে খেতে শেষ অবধি বাংলোতে পেয়ে যাই। আলাপ-পরিচয়ের পর আদর-ভালবাসা। বললেন, ‘রাতে তো থাকবেন আমাদের বাংলোতে?’ ‘থাকা এ যাত্রায় হবে না ভাই। তবে চা পর্যটনের জন্য বাংলোর সাজগোজ বিবিধ ব্যবস্থা দেখব।’ ‘সে হবে’খন।’ চা, মিষ্টিমুখ হল। পিঠে পায়েস। শিশু কোলে মেমসাহেব। বাড়ি বাগুইআটি। বড্ড বেশি নির্জনতা, একাকিত্ব। ভীষণ একঘেয়ে লাগে। কোথায় যাব, কার সঙ্গে মিশব? চা-বাগানে এ এক মহাসমস্যা। সঞ্জয়ের সঙ্গে আমরা দেখতে যাব চা পর্যটনের সুসজ্জিত অতিথিনিবাস। প্রবেশপথ ঢেকে আছে শুকনো শাল, সেগুনের

SVR
শুভমভ্যালি
রিসর্ট
পাহাড়-অরণ্য আর জলঢাকা নদী তীরে
All Luxury Facilities Available Here
SVR
ISO 9001:2008
Sukhani Basty, P.S. Nagrakata, Dist: Jalpaiguri Contact : +91 89455 25486 / 94340 43020
98300 81252, e-mail : shuvamvalleyresorts@gmail.com, www.shuvamvalleyresorts.com

পাতায়। বাঁ দিকে গোলাপি রঙের বাঁশঝাড়। সহসা চোখে পড়ল নানা বর্ণের বোগেনভিলিয়া, বাহারি চন্দ্রমল্লিকা, পিটুনিয়া, গোলাপ, কসমস, গাঁদা। বাংলোর বারান্দায় বসে দেখুন, পায়চারি করুন। ডুমুর গাছে মুনিয়া পাখিদের ভিড়। দূরে সবুজ ঘাসের আড়ালে ছাতারে পাখিদের ঝগড়া আর নিশ্চিন্ত মনে কীটপতঙ্গ অন্বেষণে ব্যস্ত ফিঙে। মনে পড়ে, খুনিয়ার জঙ্গলে একবার একাকী বসে দেখেছিলাম কাককে কীভাবে নাস্তানাবুদ করে ফিঙে। একনাগাড়ে হপ্তাখানেক এখানে ঘাঁটি গেড়ে থাকলে পাখি দেখা যায়, চেনা যায়। বনে-জঙ্গলে চক্কর কাটা, বাকি সময় অধ্যয়ন, নির্জনতার উপাসনা। এখানে এলে ঘড়ি, ক্যালেন্ডার, খবরের কাগজ, টিভির সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করতে হবে। থাকার ব্যবস্থা রাজসিক। প্রকাণ্ড হলঘরে বিছানায় শুয়ে একটু গা ছমছম তো করবেই। বাচালতা এখানে বেমানান। অবনীবাবুর খুবই পছন্দ। বললেন, ‘একবার আমি আর আপনি এখানে এসে থাকব।’

লঙ্কাপাড়া থেকে ময়নাঝোরা, মুজনাই চা-বাগান। ছোট্ট মুজনাই রেল স্টেশন। ময়নাঝোরা হয়ে চলুন রাভাবস্তি। অবনীবাবুর অনুরোধ, ‘একবার সময় করে আসুন, আপনাদের নিয়ে যাব মধ্য ছেকামারিতে মেচিয়া নাচ দেখাতে। আদর করে খেতে দেবে মুড়ি ভাজা, ভাপা পিঠা। এদের সারল্য, বিনম্র আচার-ব্যবহার মুগ্ধ করবে।’ সময় ফুরিয়ে আসছে, না হলে নিয়ে যেতাম ধুমচি জঙ্গলের পাশে প্রয়াত হীরালাল ভগতের বাড়ি দেখাতে। ধুমচি জঙ্গল একদা গহন-গভীর ছিল। অরণ্যের গভীরে হাতিরা সভা করে। গোপন ডেরায় সন্তান প্রসব করে। সন্ধ্যার পর বৃংহণ, মানুষের কান্না শোনা যায়। ধুমচি বন থেকে চাপাগুড়ি, হরিপুর, গঙ্গাপাড়ার ধানখেতে পাকা ধানের মরশুমে এলে দেখতে পাবেন হাতিদের সঙ্গে গাঁয়ের মানুষ, বনবস্তির লোকজনদের লুকোচুরি খেলা। মশালদৌড়, পটকা ফাটানো, ঢেঁড়া পেটানো হয় মহাকালের আগমনে। মহাকাল, আমার খেতের ফসল সাবাড় করিস না। বুভুক্ষু হাতিরা কর্ণপাত করে না। আসলে বনভূমি মানুষের অত্যাচারে ভীষণভাবে সংকুচিত হয়ে এসেছে। ডুয়ার্সের আদিম অরণ্য ক্রমশ শূন্য হয়ে আসছে। বাফার জোন, কোর জোনেও ঢুকলে দেখতে পাবেন উন্মত্ত মানুষ। কোথাও রক্ষকই ভক্ষক। হরিণের মাংস-মদ খেয়ে পৈশাচিক উল্লাস। অন্য দিকে ঠান্ডা ঘরে হস্তী সেমিনার, বাঘশুমারি চলছে। পরিবর্তনের সুফল পাচ্ছি কোথায় ? প্রতিরোধের পথ কোথায় ? জঙ্গল-চা-বাগান ছাড়িয়ে মুজনাই নদীর উৎসস্থলে। স্থানীয় লোকজনরা উৎসস্থলে স্নান, কাপড় কাচা, আবার জেরিক্যান, কলসিতে করে জল নিয়ে যাচ্ছে। মুজনাই নদীর এই উৎসস্থলে জল কোনও দিন শুকায় না, যত খরাই হোক না কেন। বলা বাহুল্য, এরও আবিষ্কারক অবনীবাবুই।

মুজনাই থেকে যাবার কথা ছিল গোপালপুর চা-বাগানে, কিন্তু সূর্য ডুবু-ডুবু। ক্লান্ত শরীর আর টানতে পারছে না। শিশুবাড়ি হাট, রাঙালিবাজনা হয়ে সন্ধ্যার পর ফিরে আসি অবনীবাবুর বাড়ি। একটু চা-মুড়িমাখা খেয়ে সুখ-দুঃখের আলাপ। স্বরচিত কবিতা পাঠ করে শোনালেন। ফুলবাগান দেখে আস্তানায় ফিরি। আগামীকাল টোটোপাড়া সফর। সঞ্জয়ের রেস্তরাঁয় বসা আমারই ছাত্র এখন মাদারিহাট থানার বড়বাবু। মাসকয়েক আগে দেখা হয়েছিল হলং লজের সামনে। জানি না এখন কোথায় কোন মুল্লুকে। ‘পুলিশের চাকরিতেও স্যার ঝামেলা অনেক। শান্তি নেই। কড়া হলেও বিপদ, নরম হলেও বিপদ। যাবেনটা কোথায় ? আপনি স্যার ভাল আছেন। যখন যেখানে ইচ্ছা বেরিয়ে পড়ছেন। আর এখন তো মুক্ত সন্ন্যাসী। সকালে একবার আসুন আমার কোয়ার্টারে।’ স্থানীয় মানুষজনের সঙ্গে গল্পগুজব করে উপরে উঠি। গিন্নি সটান বিছানায়। স্নান করে আমিও কিছুক্ষণ শবাসন করে নিচে নেমে আসি। অবনীবাবুর সঙ্গে আগামীকালের বেড়ানো এবং বনের বাইরে বন সাফারি, মাদারিহাটের কিছু সমস্যা নিয়ে আলোচনা হয়। ভোরবেলা ঘুম ভাঙলে মুখ-হাত ধুয়ে বাইরে বার হই চায়ের খোঁজে। ঝোড়ো হাওয়ার মতো দূরপাল্লার ট্রেন দশ দিক কাঁপিয়ে চলে গেল আসামের দিকে। ভোরের মাদারিহাট। ট্রাকের উৎকট আওয়াজ ডিঙিয়ে মাদারিহাট থানা পেরিয়ে মন্দিরে দেখা হল ছাত্রের সঙ্গে। বললাম, ‘চায়ের ব্যবস্থা কর।’ ‘চলুন স্যার আমার কোয়ার্টারে।’ মাদারিহাট প্রকৃতিবীক্ষণকেন্দ্রের কাছে যাই। গন্ডার মহাশয় সকাল-বিকেল দু’বেলা দর্শন দেন। হাতির পিঠে চেপেও অনেকে হেলতে-দুলতে যান, তাতে আরও রোমাঞ্চ। শুকনোঝোরার গায়ে বনের বাইরে বন সাফারির বিজ্ঞাপন। অনেকে লাগোয়া শালবনে পিকনিক করতে আসেন। ফিরে আসি মাদারিহাট বাজারে। দোকানপাট, হোটেল, লজ, চা-মিষ্টির দোকান একটা-দুটো খুলেছে। চল্লিশ বছর আগের স্মৃতি একটু একটু মনে পড়ে। নেপালবাবু, রঞ্জনবাবু, ননীদা, হাটতলায় হলং ভিউ হোটেল। বাজারের উপরে একটাই মিষ্টির দোকান ছিল। আমার ভবঘুরে জীবনে মাদারিহাটকে ঘিরে বিস্তর স্মৃতি আজও জ্বলজ্বল করে। মনে পড়ে বেণুর মোহর পত্রিকা নয়ের দশকে প্রকাশিত হয়েছিল। মুক্তারাম টোটোর লেখা সংচুপা ও মানারী গল্প। তিতিখোলা, বাংরিখোলা। সন্ধ্যায় হ্যাজাক জ্বলত। এখন জমজমাট মাদারিহাট। হাঁটতে হাঁটতে চলে আসি ফ্যামিলি টুরিজম সেন্টার। গিন্নির প্রশ্ন, ‘ভোরবেলায় স্বপ্ন দেখলাম হাতির পিঠে জলদাপাড়া যাচ্ছি। তুমি হঠাৎ নলখাগড়ার কাদাজলে পড়ে যেতেই আমি চিৎকার। ব্যাস, ঘুম ভেঙে গেল।’ বললাম, ‘স্বপ্ন কখনও সত্যি হয় না। আমি মাঝে মাঝে স্বপ্ন দেখি এভারেস্টের চূড়ায় বসে কফি খাচ্ছি।’ হঠাৎ দরজায় খটখট। চায়ের খবর। বললাম, ‘নিচে নামছি।’ অবনীবাবু প্রাতঃভ্রমণ সেরে খোঁজ নিয়ে গেলেন। প্রাতরাশ সেরে বেরিয়ে পড়তে হবে। সারাদিনের জন্য টোটোপাড়াতে টোটো কোম্পানি। হাসিমারার কাছে পুরনো ট্রলি লাইন দিয়ে যাওয়া। বললাম, রেডি হতে বেশিক্ষণ লাগবে না। শুধু ব্রেকফাস্ট সারতে যতক্ষণ। ঝোলা তো সঙ্গেই আছে। গিন্নিকে বলি, ‘ঝটপট তৈরি হয়ে নাও। স্নান করে নিতে পারো গরম জলে।’ পুচকি এল যথাসময়ে। নাস্তা সেরে অবনীবাবুকে বগলদাবা করে সস্ত্রীক জিপের ভিতর ঢুকি। পুচকি মুচকি হেসে বলে, ‘কাকু, আমরা যে পথ ধরে টোটোপাড়ার দিকে যাব, অনেকেই জানে না। সেই জন্য তোমাকে নির্বাচন করেছি।’ অবনীবাবু বললেন, ‘পুচকি বড় ভাল ছেলে, কিন্তু মাঝে মাঝে দুষ্টুমি করে। আমি যেভাবে বলব, সেভাবেই স্টিয়ারিংটা ঘোরাবে। হাতি সামনে পড়লে নার্ভাস হবে না।’ ‘কী যে বলেন কাকু।’ জাতীয় সড়ক থেকে বাঁ দিকে তোর্সা নদী ছুঁয়ে কাঁকর-মাটি, শুকনো পাতায় ছাওয়া পথ। বাঁ দিকে জঙ্গল। ডান দিকে নদী-পাহাড়। দুর্ধর্ষ ল্যান্ডস্কেপ। ‘বাঁ দিকে ওই যে সরু পথ চলে গিয়েছে, ওখানে ঢুকে পড়লে নির্ঘাত হাতির মুখোমুখি হব। কাকিমা রাজি আছেন ?’ ‘না রে। অবনীদার কথা শোন।’ চা-বাগান, জঙ্গল পেরিয়ে একের পর এক নদী তিতি, বাংরি, হাউরি, যার বিস্তৃতি ব্যাপক, বিশাল। ভূখণ্ড জুড়ে শুধু বালু, পাথর আর মরা গাছের ডালপালা। প্রতি বছর প্রবল বৃষ্টিতে পাহাড়

ডুয়ার্সের আদিম অরণ্য ক্রমশ শূন্য হয়ে আসছে। বাফার জোন, কোর জোনেও ঢুকলে দেখতে পাবেন উন্মত্ত মানুষ। কোথাও রক্ষকই ভক্ষক। হরিণের মাংস-মদ খেয়ে পৈশাচিক উল্লাস। অন্য দিকে ঠান্ডা ঘরে হস্তী সেমিনার, বাঘশুমারি চলছে। পরিবর্তনের সুফল পাচ্ছি কোথায় ? প্রতিরোধের পথ কোথায় ? জঙ্গল-চা-বাগান ছাড়িয়ে মুজনাই নদীর উৎসস্থলে। স্থানীয় লোকজনরা উৎসস্থলে স্নান, কাপড় কাচা, আবার জেরিক্যান, কলসিতে করে জল নিয়ে যাচ্ছে।

তছনছ করে উদ্যত সাপের ফণার মতো যেদিকে খুশি ছুটতে থাকে। সভ্য জগৎ থেকে টোটোপাড়া বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়।

বছর চল্লিশ আগে প্রথম বেড়ানো টোটোপাড়া। জনস্বাস্থ্য কারিগরি বিভাগের ইঞ্জিনিয়ারের সঙ্গে জিপে ঝাঁকুনি খেতে খেতে মাঘের কনকনে হিমেল সন্ধ্যায় টোটোপাড়া পৌঁছে দেখি কমলালেবুর আড়তে গমগমে ভিড়। ইঞ্জিনিয়ার মশাই টোটোবস্তিতে জলের ব্যবস্থার সমীক্ষার জন্য স্থানীয় মাতব্বরদের সঙ্গে কথাবার্তা বলছেন। আমার কর্ম টোটোবস্তিতে ঘুরে বেড়ানো, সঙ্গী ববি টোটো। তারও সম্ভবত কমলার ব্যবসা ছিল। ভুটান পাহাড় থেকে টোটো, নেপালি সম্প্রদায় ঝুড়ি, টুকরিতে কমলা বোঝাই করে টোটোপাড়াতে নিয়ে আসত। এখানেই প্যাকিং, আলাদা করা, মানে ছোট-বড় আকার পৃথক করা। লঙ্কাপাড়া থেকে সেবার হেঁটে টোটোপাড়াতে এসেছিলাম। শিশুবাড়ির দু’-চারজন বঙ্গসন্তানের সঙ্গে পরিচয় হয়েছিল, যাঁরা টোটোপাড়ার গুদামজাত সুপারি সংগ্রহ করতেন। যা-ই হোক, রাতে থাকা-খাওয়ার কষ্ট দেখে আমরা রাত্রি যাপন করেছিলাম বল্লালগুড়ি বিটবাবুর বাংলোতে। গভীর রাতে বিটবাবুর সঙ্গে তোর্সা নদী সংলগ্ন জঙ্গল ঘুরে বেড়াই। সেসব এখন ধূসর স্মৃতি। ঝাঁকুনিতে সংবিৎ ফেরে— অবনীবাবু দৃষ্টি আকর্ষণ করেন, ‘ওই দেখুন টোটারা আসছে।’ ওয়েলকাম টু টোটোপাড়া। সৌজন্যে উত্তরবঙ্গ ক্ষেত্রীয় গ্রামীণ ব্যাঙ্ক। ভবেশ টোটোর বাড়ির কাছে পুচকি জিপ দাঁড় করায়। প্রয়োজনে টোটোপাড়ার রাত্রিযাপনে কোনও কষ্ট নেই। টোটোদের এখন বলা যাবে না ভ্যানিশিং ট্রাইব।

টোটোপাড়ায় বর্তমান সবরকম সুবিধা আছে। মোবাইল টাওয়ার কবে বসে গিয়েছে। হিন্দি গানের সিডি, ডিভিডি, ঘরে ঘরে মাধ্যমিক, প্রাথমিক ইংরেজি মাধ্যম। সত্যি কথা বলতে কী, লুথারেন ওয়ার্ল্ড সার্ভিস নামে একটি সুইডেনের মিশনারি সংস্থা শিক্ষা বিষয়ে টোটোদের সচেতন করে তোলে। এ বিষয়ে ধনপতি টোটোর নাম কৃতজ্ঞ চিত্তে উল্লেখ করতেই হয়। ১৯৮১ সালে ভক্ত টোটো মাধ্যমিক পাশ করেন। আধুনিকতার ছোঁয়ায় টোটো ছেলেমেয়েদের পোশাক-আশাকের পরিবর্তন ঘটেছে। হাতে হাতে মোবাইল। সরকারি-বেসরকারি দপ্তরে কাজ করছে। কৃষিকাজ, পশুপালন সবই করছে। টোটোরা ভাল থাকুক, আমরাও চাই। তবু অনেক পর্যটক আজও মনে মনে কল্পনা করেন, টোটোরা বুঝি আন্দামানের জারোয়াদের মতো। জলদাপাড়ায় গন্ডার দর্শন করে চলুন যাই টোটোপাড়া। মাদারিহাট থেকে টোটোপাড়ার পথটি বড্ড বাজে। বেড়ানোর আনন্দটাই বরবাদ। এসব নিয়ে পর্যটন দপ্তর আদিবাসী উন্নয়ন কল্যাণ দপ্তর একটু ভাবুন। হচ্ছে-হবে করেই বছর ঘুরছে। শ্রদ্ধেয় ডা. চারুচন্দ্র সান্যাল মহাশয় চারের দশকে দুর্গম গহন অরণ্য ঘেরা টোটোবস্তিতে প্রবেশ করেন, কঠোর পরিশ্রমের কাজ। তাঁরই লেখা সভ্য মানুষজনের কাছে আলোড়ন সৃষ্টি করে। ধীরে ধীরে টোটো সম্প্রদায় সভ্যতার আলোকে আলোকিত হয়। চারুবাবুর পর অনেক লোকসংস্কৃতিপ্রেমী টোটোদের জীবনযাপন, খাদ্য-পানীয়, বাসস্থান, ভাষা ইত্যাদি নিয়ে প্রবন্ধ, পুস্তক রচনা করছেন। অনেকে ডক্টরেটও নাকি পেয়েছেন। কয়েক বছর আগে মাদারিহাট রেঞ্জ অফিসে পরিচয় হয়েছিল স্বপনবাবুর সঙ্গে।

টোটোপাড়ায় উন্নয়ন, শিক্ষা, আদিবাসী জাগরণ ইত্যাদির সভাপতি। বিভিন্ন স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা টোটোদের সর্বাঙ্গীণ মঙ্গল-কল্যাণ কামনায় ঝাঁপিয়ে পড়েছে। উদ্দেশ্য মহৎ। টোটোরা আরও অগ্রগতির পথে এগিয়ে চলুক। পুচকি বলে, ‘কাকু, চলুন টোটোদের প্রাচীন ঘরবাড়িতে।’ অবনীবাবুও বললেন, ‘চলেন, একটু দেখে আসি।’ উঠোনে শুয়োর, মুরগি, কুকুরের সহাবস্থান। কোথাও মারুয়া, ভুট্টা রোদে শোকানো হচ্ছে। ঘরে ঘরে হাড়িয়া তৈরি হচ্ছে। মদ্যপান এসব জায়গায় বন্ধ করা কঠিন। মহিলারা গৃহস্থালি কাজে ব্যস্ত। খড়, বাঁশ, কাঠের তৈরি ছাউনি দেওয়া ঘর, বারান্দায় বসি। অবনীবাবুর দু’-চারটে প্রশ্ন, ‘তোমরা কেমন আছ?’ উত্তর দেবে কী, হাসতে হাসতে লুটিয়ে পড়ে। আবার দু’-চারজন চেনা মুখ। আকণ্ঠ পান করে চেঁচায়, ‘কমরেড, লাল সেলাম। জিন্দাবাদ।’ অবনীবাবুকে জড়িয়ে ধরে। টোটোদের মন্দিরে প্রবেশ করি। ঢোলবাদ্য, অনুষ্ঠানের জন্য প্রয়োজনীয় সব কিছুই রয়েছে। মন্দির ছাড়িয়ে জঙ্গল, খেতখামারের পাশ দিয়ে পাহাড়ের পাদদেশে চলে আসি। পুচকির এক টোটো বন্ধুর সঙ্গে পরিচয় হল। টোটোপাড়ায় বিভিন্ন গাঁওয়ের সমষ্টি। যেমন মণ্ডল গাঁও, সুব্বা গাঁও, পূজা গাঁও। দু’-একজন টোটো যুবকের প্রশ্ন, ‘আপনি কেন এসব জানতে চাইছেন?’ অবনীবাবু বলেন, ‘উনি একজন পরিব্রাজক। টোটোপাড়া বেড়াতে এসেছেন। নেতা-টেতা নন। বলতে পারো মুসাফির। ওঁর ইচ্ছে, টোটোপাড়াতে পর্যটনের প্রসার ঘটুক। এতে টোটো জনজাতিরই লাভ।’

আমার মনে হয়, টোটোপাড়াতে এই মুহূর্তে টোটোদের চেয়ে নেপালি ভাষাভাষীর সংখ্যা বাড়ছে। হঠাৎ দু’টি সম্প্রদায়কে দূর থেকে চেনাই কঠিন। টোটোরা মঙ্গোলয়েড জনগোষ্ঠীভুক্ত। দাড়ি-গোঁফ কম। টোটোরা নিজেদের ভাষা বলে, হরফ সেই বাংলা। সকলেই গড়গড়িয়ে বাংলা বলতে পারে। অবনীবাবুকে বললাম, ‘এভাবে হ্যারিকেন টুরে টোটোপাড়ার উন্নতি-অবনতি কিছুই বুঝতে পারব না। এবার চলুন, যদি চা-টা কোথাও পাওয়া যায়।’ অনেক খোঁজাখুঁজি করে বাজারের মধ্যে গ্রামীণ ব্যাঙ্কের মুখোমুখি একটা চা-মিষ্টির দোকান পেলাম। খুরমা, গজা, নিমকি, চা পাওয়া যায়। হাটের দিন কেনাবেচা বাড়ে। চা-দোকানে পরিচয় হল ঘর্মবাহাদুর শর্মার সঙ্গে।

যত দূর মনে পড়ে, উনি অবসরপ্রাপ্ত মাস্টারমশাই। টোটো জনজাতি সম্পর্কে যথেষ্ট ওয়াকিবহাল। তাঁর সঙ্গে গল্প করে খুবই আনন্দ পেলাম। অবনীবাবু বললেন, ‘এর পর দু’-চারদিনের জন্যে এসে টোটোপাড়া থাকুন। থাকা ও খাওয়ার ব্যবস্থা হয়ে যাবে। দরকার হলে আমিও আপনাদের সঙ্গে থাকব। চলুন, এবারে দেখে আসি টোটোদের জন্য সরকারি উদ্যোগে বাঁধানো জলাশয়।’ মাছ চাষ হয়। বাঁশঝাড়, সুপারিবন, জঙ্গলের ভিতর দিয়ে জলাশয়ে পৌঁছে মুগ্ধ হই। অবনীবাবুর কর্মজীবনের এটি একটি সাক্ষী। ‘সরকারি পয়সা তো নানাভাবে নয়-ছয় হয়। জনসেবা সকলেই করেন। আমিও চেষ্টা করেছি মাত্র। মনে রবে কি না রবে আমারে।’ জাল ফেলে মাছ ধরা হল। ছোট মাছ। রাতে মাছ চচ্চড়ি হবে। ‘এবারে চলুন যাই বল্লালগুড়ি রেঞ্জ, আগামী দিনে এখানে শুনেছি বনবাংলো তৈরি হবে।’ টোটোপাড়ার বনভূমি কিন্তু ভীষণভাবে কমে এসেছে। পুচকি বলল, ‘বাঁ দিকের চা-দোকানে ফার্স্ট ক্লাস চা পাওয়া যায়।’ অবনীবাবুর তাড়া আছে। তাড়াতাড়ি পৌঁছাতে হবে মাদারিহাট। নদী, জঙ্গল পেরিয়ে মাদারিহাট লেবেল ক্রসিং। দুপুরে পেটে দানাপানি পড়েনি। সঞ্জয়কে খবর পাঠাই, বৈকালিক জলযোগের ব্যবস্থা করতে। রুটি পরোটা যা হোক। লেবেল ক্রসিং-এ আটকে আছি। মহানন্দা লিঙ্ক এক্সপ্রেস আসছে দিল্লি থেকে আলিপুরদুয়ার জংশন। সন্ধ্যার আগেই পৌঁছে গেলাম মাদারিহাট।

মাদারিহাটে মাথা গোঁজার ঠাই

বহুল প্রচারিত হলং বনবাংলো, জলদাপাড়া টুরিস্ট লজ তো আছেই। এর বাইরে ব্যক্তিগত উদ্যোগে হোটেল, লজ, রিসর্ট, ধর্মশালা গড়ে উঠেছে। সংখ্যা প্রতি বছর বাড়ছে। আমার জানা-চেনার মধ্যে উল্লেখ করছি।
তিথি লজ: ৯৭৩৩১-৪১১৮১, ০৩৫৬৩-২৬২২৯০ **অতিথি লজ:** ০৩৫৬৩-২৬২৫০৮ **জলদাপাড়া ফ্যামিলি টুরিজম সেন্টার:** ৯৭৩৪৯-৬৫১৩১ **টুরিস্ট নেস্ট:** ৯৭৩৩৪৩৭৩২৭। এ ছাড়া জঙ্গল লাগোয়া বিশ্বজিৎ সাহার জলদাপাড়া ম্যাল ক্যাম্প। এক কথায় অনবদ্য, অসাধারণ। ৯৮৩২০-৮৮৯৮৪।

গৌরীশংকর ভট্টাচার্য

তোমার জাদুতে মাতে জীবনের ছন্দ

নতুন বছরের শুভ কামনায়

'নিয়মিত খেলাধুলো ও শরীর চর্চা মানুষ ও জাতি গঠনে বিশাল ভূমিকা নেয়,
মনের সুস্থ বিকাশ ঘটাতে সাহায্য করে। তাই হারা বা জেতা কোনওটাই নয়,
খেলায় অংশগ্রহণ করাটাই আসল লক্ষ্য হওয়া উচিত।'

www.eliteshoe.com JOIN US :

Elite®
FOOTWEAR
পায়ে পায়ে আনন্দ

VISTAAR

ভারতীয় ছিটবাসীরা চিরদিনই উপেক্ষিত সুশীল সমাজ কিংবা প্রশাসনের চোখে

একদিকে নিজেদের সংঘবদ্ধ হওয়ার প্রয়াস, অন্য দিকে ছিটমহলে স্বাধীনতা দিবস উদ্‌যাপনকে কেন্দ্র করে সংঘটিত ঘটনাপ্রবাহ— কোচবিহার জেলা প্রশাসনকে সবিস্তারে জানানোর লক্ষ্যে জোর তৎপরতা শুরু করে ছিটমহল ইউনাইটেড কাউন্সিল। কাউন্সিলের এক প্রতিনিধিদল ২২ অগাস্ট ২০১৪ তারিখে কোচবিহার জেলাশাসকের কাছে এক স্মারকলিপি প্রদান করেন। স্মারকলিপিতে তাঁরা উল্লেখ করেন যে, বাংলাদেশি দুষ্কৃতীদের ধারাবাহিক অত্যাচারে ১৫০ নং ছিট তালুক দাশিয়ারছড়ার বাসিন্দারা বিপন্ন বোধ করছে। স্বাধীনতা দিবস পালনের আগে তাদের হুমকি দেওয়া হয় যে, স্বাধীনতা দিবসে ভারতের জাতীয় পতাকা তুললে তাদের বিপদ হবে। শুধু তা-ই নয়, ছিটমহলের বাইরে বাংলাদেশে কেনাকাটা করতে গেলে পাসপোর্ট আইনে গ্রেপ্তার, মিথ্যা মামলায় হেনস্তা ইত্যাদির মাধ্যমে তাদের ভয় দেখানোর চেষ্টাও করা হয়। ছিটবাসীদের নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করার জন্য ছিটমহল ইউনাইটেড কাউন্সিল জেলাশাসকের কাছে দাবি জানায়।

নিরাপত্তার দাবিতে কোচবিহারের জেলাশাসককে স্মারকলিপি দেওয়ার এক মাসের মধ্যেই এক বড়সড় হামলার সম্মুখীন হয় দাশিয়ারছড়ার ছিটবাসীরা। ভারতীয় ছিটমহলে ভারতের পতাকা উড়িয়ে স্বাধীনতা দিবস উদ্‌যাপনের পরিণতি যে এতটা ভয়ংকর হবে তা আন্দাজ করতে পারেনি দাশিয়ারছড়ার ছিটবাসীরা। ভারতের স্বাধীনতা দিবস উদ্‌যাপনের পরবর্তী সময়ে চাপা উত্তেজনা থাকলেও দাশিয়ারছড়ার আপাত নিস্তরঙ্গ সমাজজীবনে অভ্যস্ত মানুষজন অনেকটাই ফিরে গিয়েছিল তাদের চিরাচরিত স্বাভাবিক ছন্দে। কৃষিনির্ভর মানুষজন সারাদিন হাড়ভাঙা পরিশ্রমের পর প্রতিদিনের মতো কালীরহাটে সন্ধ্যায় আড্ডায় মেতে ওঠে। সকালেও এই ছোট গঞ্জটি কিছু সময়ের জন্য হয়ে ওঠে কোলাহলমুখর। এ যেন কবি যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্তর ‘হাট’ কবিতার সেই বিখ্যাত পঙ্‌ক্তি— ‘নূতন করিয়া বসা আর ভাঙা পুরানো হাটের মেলা; দিবসরাত্রি নূতন যাত্রী, নিত্য নাটের খেলা!’

কালীরহাটে সত্যি সত্যি নিত্য নাটের খেলা। গোটা তিরিশেক ছোট-বড় দোকানকে কেন্দ্র করে একটা ছোট্ট গঞ্জ। প্রতি শনি ও মঙ্গলবার সেখানে হাট বসে। তবে প্রতি সন্ধ্যায় বসে বাজার। এমনিতে কালীরহাটে রয়েছে মুদিখানা দোকান, কাপড়ের দোকান, ডাক্তারখানা, সাইকেল রিপেয়ারিং-এর দোকান, সেই সঙ্গে গোটাকয়েক সবজি, মাছ ও মাংসের দোকান। হাটের পূর্ব পাশে ছিটমহল ইউনাইটেড কাউন্সিলের কার্যালয়। সামনে প্রশস্ত ফাঁকা জায়গা। এর কিছুটা পশ্চিমে অপর সংগঠন ছিটমহল বিনিময় সমন্বয় সমিতির কার্যালয়। হাটের মধ্যেই রয়েছে একটি মাদ্রাসা। হাটের দিন লোক সমাগম যথেষ্টই। দোকানপাট কিংবা ছোট ছোট হরেক কিসিমের পসরা সাজিয়ে বসা বিক্রেতাদের সঙ্গে ক্রেতাদের মেলবন্ধন সরগরম করে তোলে কালীরহাটকে। হাটের অদূরে বয়ে চলেছে শীর্ণকায়া নীলকুমার নদী। নদীর উপর বাঁশের সাঁকো পেরলেই বাংলাদেশের ভূখণ্ড। সব মিলিয়ে একটি গ্রামীণ গঞ্জ বা হাট যা হয়, তার থেকে কালীরহাট ব্যতিক্রম নয়।

১৫ সেপ্টেম্বর ২০১৪। সরগরম কালীরহাট। ছিটমহল ইউনাইটেড কাউন্সিল ১০ সেপ্টেম্বর ২০১৪ থেকে এক প্রচার কর্মসূচির ডাক দেয়। লক্ষ্য, দাশিয়ারছড়া ছিটবাসীদের মধ্যে যারা ভারতীয় নাগরিকত্ব নিতে ইচ্ছুক, তাদের শনাক্তকরণ। অর্থাৎ ছিটমহল সমস্যা সমাধান পর্বে ভারতীয় পরিচয় বজায় রেখে পরবর্তী পদক্ষেপ গ্রহণের জন্য ঐক্যবদ্ধ আন্দোলনের আহ্বান। এক কথায় ভারতীয় নাগরিকত্বের সংগ্রাম। ১০ সেপ্টেম্বর থেকে শুরু হওয়া কাউন্সিলের প্রচার কর্মসূচিতে প্রমাদ গুনতে শুরু করে ‘ছিটমহল বিনিময় সমন্বয় সমিতি’। অন্য দিকে, কালীরহাটের ছিটমহল ইউনাইটেড কাউন্সিল দপ্তরে প্রতিদিনের লোক সমাগম বাংলাদেশপন্থীদের শিরঃপীড়ার কারণ হয়ে দাঁড়ায়। ছিটমহল বিনিময় আন্দোলনে মৌরসিপাট্টার হকদার ওই কমিটির মুখোশ ক্রমশ উন্মোচিত হতে শুরু করে। তাদের হিংস্র দাঁত-নখ ধীরে ধীরে বেরিয়ে আসতে থাকে। হয়ত বা বাংলাদেশ ভূখণ্ড থেকে তাদের উপর এমনই নির্দেশ দিতে থাকে তাদের ‘থিঙ্ক ট্যাঙ্ক’রা। বিনিময় সমিতির সমস্ত বিষয়টি কাদের

ভারতীয় ভূখণ্ড হিসেবে স্বীকৃত ভারতীয় ছিটমহলের একজন বাসিন্দা বাংলাদেশি দুষ্কৃতীদের হাতে আহত হলেন। অথচ কূটনৈতিক জটিলতার কারণে তাঁকে মূল ভূখণ্ডে এনে চিকিৎসা করানো সম্ভব হল না। বোঝা যায়, বাংলাদেশ ঘেরা ভারতীয় ছিট ভূখণ্ডের অধিবাসীদের জীবনযন্ত্রণা কোন পর্যায়ে পৌঁছেছিল। সারাদিন সুচিকিৎসার আশায় সীমান্তের কাঁটাতারের ওপারে অপেক্ষা করার পর মূল ভূখণ্ডে প্রবেশে অসমর্থ হয়ে আহতর আত্মীয়-পরিজন তাঁকে চিকিৎসার উদ্দেশ্যে সাত-সাতটি নদী অতিক্রম করে নিয়ে যায় প্রায় ১০০ কিমি দূরের আসাম সীমান্ত সংলগ্ন গ্রাম রাজারহাটে। একটার পর একটা এ ধরনের ঘটনা ঘটে চলে অথচ নির্বিকার প্রশাসন। এমনকি সুশীল সমাজ, তাঁরাও কখনও উচ্চবাচ্য করেননি। ফলে ছিটবাসীদের জীবনযন্ত্রণা অন্ধকারেই ঢাকা থাকে। গত ১৩টি পর্বে ছিটমহল নিয়ে বহু অজানা কথাই ফুট উঠেছিল ‘ছিটমহলের ছেঁড়া কথা’তে। এই পর্বটি ছিটকথার **শেষ পর্ব**।

ছিটমহল ইউনাইটেড কাউন্সিলের মহামিছিলের ডাকে আতঙ্কিত ছিটমহল বিনিময় সমন্বয় সমিতি ১৩ সেপ্টেম্বর ২০১৪-য় এক বৈঠকে মিলিত হয়ে ১৫ সেপ্টেম্বর পালটা কর্মসূচির ডাক দেয়। মিছিলের প্রত্যুত্তরে পালটা মিছিল। এবার আসরে নেমে পড়ে বাংলাদেশের কুড়িগ্রাম জেলার ফুলবাড়ি থানার পুলিশ।

মস্তিষ্কপ্রসূত তা রহস্যাবৃত থাকলেও তাদের প্রতিটি পদক্ষেপ যে ভারতের স্বার্থ বিরোধী তা আরও প্রকাশ্যে আসে দাশিয়ারছড়ার বুকে সংঘটিত একের পর এক ঘটনার মধ্যে দিয়ে।

ছিটমহল ইউনাইটেড কাউন্সিলের মহামিছিলের ডাকে আতঙ্কিত ছিটমহল বিনিময় সমন্বয় সমিতি ১৩ সেপ্টেম্বর ২০১৪-য় এক বৈঠকে মিলিত হয়ে ১৫ সেপ্টেম্বর পালটা কর্মসূচির ডাক দেয়। মিছিলের প্রত্যুত্তরে পালটা মিছিল। এবার আসরে নেমে পড়ে বাংলাদেশের কুড়িগ্রাম জেলার ফুলবাড়ি থানার পুলিশ। তারা কালীরহাটে এসে আইনশৃঙ্খলার প্রশ্ন তুলে শুরু করে খবরদারি। মিজানুর রহমানের ভাষায়, ‘ফুলবাড়ি থানার আইবি এসে আমাদের বলে, ওরা হাটের একপাশ দিয়ে মিছিল করবে, আপনারা অন্য দিক দিয়ে করবেন। ওরা সকাল ৮টায় মিছিল শুরু করবে, আপনারা একটু তফাত রেখে মিছিল করুন।’ যথারীতি তাদের পরামর্শ শিরোধার্য করে ছিটমহল ইউনাইটেড কাউন্সিল ওই দিন একটু বেলার দিকে মিছিল করার সিদ্ধান্ত নেয়। এদিকে ১৫ তারিখের মিছিলকে কেন্দ্র করে উত্তেজনার পারদ ক্রমশ চড়তে শুরু করে দাশিয়ারছড়ায়।

১৫ সেপ্টেম্বর ২০১৪ সকাল ৯টা। মিছিল শুরু করে বিনিময় কমিটি। মিছিলে শামিল সমর্থকদের সিংহভাগই বাংলাদেশি। মিছিলও একেবারে সশস্ত্র। ওদিকে সে দিন সকালে কালীরহাটে কাউন্সিলের দপ্তরে উপস্থিত কয়েকশো ছিটবাসী মিছিলের সময় বদলের কথা জানতে পেরে বাড়ি ফেরে। আসলে দীর্ঘ সময় ধরে মহামিছিল করবার লক্ষ্যেই তারা বাড়ি থেকে খাওয়াদাওয়া করে আসার পরিকল্পনা করে। তবে সংগঠনের কর্মকর্তারা কালীরহাটেই থেকে যায়। ইতিমধ্যে বাংলাদেশ ভূখণ্ড থেকে শুরু হয়ে বিনিময় কমিটির মিছিল ছিটমহলের বিভিন্ন প্রান্ত পরিক্রমা করে বেলা ১১টা নাগাদ কালীরহাটে প্রবেশ করে। একেবারেই সশস্ত্র ও মারমুখী তাদের অবয়ব। তাদের শরীরী ভাষায় হিংসার লোলুপতা। মিছিলে অংশগ্রহণকারী উন্মত্ত লোকজন কালীরহাটে প্রবেশ করে মারমুখী হয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ে ছিটমহল ইউনাইটেড কাউন্সিলের সদস্যদের উপর। এলোপাথাড়ি মার চলে। রণক্ষেত্রের চেহারা নেয় কালীরহাট। দোকানপাট নিমেষের মধ্যে ঝাঁপ ফেলে দেয়। হাটের লোকজন পালাতে শুরু করে। বেশ কয়েকজন কাউন্সিলের সমর্থক গুরুতর আহত হন। হামলা চালিয়ে বিনিময় কমিটির সমর্থকরা তারপর বাংলাদেশ ভূখণ্ডের দিকে পালিয়ে যায়।

ঘটনার আকস্মিকতায় হতচকিত হয়ে পড়েন ভারতপন্থী ছিটমহল ইউনাইটেড কাউন্সিলের সদস্যরা। তাঁদের নেতা মিজানুর রহমানের বয়ান অনুসারে, ফুলবাড়ি থানার আইবি-র জনৈক কর্মী আমাদের কৌশলে বিভ্রান্ত করেছে, এবং বিনিময় কমিটির সঙ্গে যোজসাজশ করে পূর্ব পরিকল্পনামাফিক এই আক্রমণ সংঘটিত করতে মদত জুগিয়েছে। শুধু তা-ই নয়, কর্মসূচি পালনের দু’দিন আগে বর্ডার গার্ডের পক্ষ থেকে হুমকি দেওয়া হয়, যাতে ছিটমহল ইউনাইটেড কাউন্সিল মিছিল করার পরিকল্পনা বাতিল করে। ছিটমহল ইউনাইটেড কাউন্সিলের দাশিয়ারছড়া শাখার অভিযোগ, বিনিময় কমিটির নেতা গোলাম মোস্তাফা, আলতাফ হোসেন, রেজ্জাক আলি, আমজাদ হোসেন, মহঃ মনিরুদ্দিন, নুর ইসলাম, সোলেমান আলি, হানিফ আলি, এডাহক আলি, প্রতাপ বর্মন, আব্বাস আলি, মোজাফফর আলি প্রমুখের নেতৃত্বে এই আক্রমণ সংগঠিত হয়। বিনিময় কমিটির মারমুখী আক্রমণে ছিটমহল ইউনাইটেড কাউন্সিলের মোসারা হোসেন, সারোয়ার আলম, মোজাম্মেল হক, খলিলুর রহমান, আতাউর রহমান প্রমুখ আহত হন। এঁদের মধ্যে মোসারফ হোসেনের আঘাত ছিল গুরুতর। তাঁকে ভ্যান রিকশায় চাপিয়ে ভারতীয় সীমান্তের সেউতি ২ নং সীমান্ত চৌকির ২২ নং গেটে আনা হয়।

এদিকে, ঘটনার খবর সীমান্ত টপকে কোচবিহারের সাংসদ রেণুকা সিনহার কাছে পৌঁছালে তিনি জেলাশাসক ড. পি উলগানাথনকে বিষয়টি সম্পর্কে অবহিত করেন। এ ছাড়াও জলপাইগুড়ির বিধায়ক ড. সুখবিলাস বর্মা ও দার্জিলিঙের সাংসদ সুরিন্দর সিং আলুওয়ালিয়া দাশিয়ারছড়ার ঘটনাবলি প্রশাসনের বিভিন্ন স্তরে জানাতে উদ্যোগী হন। সাংসদ সুরিন্দর সিং আলুওয়ালিয়া বিষয়টি দিল্লির কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রক ও পররাষ্ট্র মন্ত্রকের নজরে আনতে সক্রিয় ভূমিকা পালন করেন। যদিও সারাদিন টানাপোড়েনের পর গুরুতর আহত মোসারফ হোসেনকে সীমান্ত গেট দিয়ে দিনহাটা হাসপাতালে আনা সম্ভব হয়নি পদ্ধতিগত জটিলতার জন্য। তবে সীমান্তরক্ষী বাহিনীর ১২ নং ব্যাটেলিয়ানের সেউতি-২ নং ক্যাম্প কমান্ড্যান্টের আন্তরিক প্রয়াসে সীমান্ত গেটের ওপারে মোসারেফের চিকিৎসা হয়। কিন্তু যেটা দুর্ভাগ্যের, ভারতীয় ভূখণ্ড হিসেবে স্বীকৃত ভারতীয় ছিটমহলের একজন বাসিন্দা বাংলাদেশি দুষ্কৃতীদের হাতে আহত হলেন। অথচ কূটনৈতিক জটিলতার কারণে তাঁকে মূল ভূখণ্ডে এনে চিকিৎসা করানো সম্ভব হল না— এর থেকে বোঝা যায়, বাংলাদেশ ঘেরা ভারতীয় ছিট ভূখণ্ডের অধিবাসীদের জীবনযন্ত্রণার প্রকৃত স্বরূপ। সারাদিন সুচিকিৎসার আশায় সীমান্তের কাঁটাতারের ওপারে অপেক্ষা করার পর মূল ভূখণ্ডে প্রবেশে অসমর্থ হয়ে অতঃপর মোসারেফের আত্মীয়-পরিজন তাঁকে চিকিৎসার উদ্দেশ্যে সাত-সাতটি নদী অতিক্রম করে নিয়ে যায় প্রায় ১০০ কিমি দূরের আসাম সীমান্ত সংলগ্ন গ্রাম রাজারহাটে। সেখানে হাতুড়ে ডাক্তারের চিকিৎসায় তাঁর আরোগ্যলাভ হয়।

ভারতীয় ছিটমহলগুলির যে সকল ঘটনাপ্রবাহ এই রচনার মধ্যে দিয়ে পাঠকদের দৃষ্টিগোচর হল তা এক কথায় সিন্ধুতে বিন্দুসম। এইসব মানুষের জীবনযন্ত্রণার কাহিনি কখনওই সেভাবে ভারতীয় সুশীল সমাজের দৃষ্টিগোচর হয়নি। অন্য দিকে তাদের মধ্যেও হয়ত আগ্রহের সঞ্চার করাতে সক্ষম হয়নি প্রকৃত ভারতীয় ছিটবাসীরা। কারণ, জাল ভারতীয় ছিটবাসীদের ধূর্তামি, ছিট বিনিময় আন্দোলনের মুখোশধারী ভারত-বিরোধী শক্তির ছলচাতুরী ভারতীয় সংবাদমাধ্যমের বহু প্রতিষ্ঠান ও সাংবাদিককে মোহগ্রস্ত করে রেখেছিল। প্রকৃত সত্য অনুধাবনের ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করা হয়েছিল ছলে-বলে-কৌশলে। হয়ত এর মধ্যে ‘অর্থ’ হয়ে উঠেছিল বড় ফ্যাক্টর। এই সমস্ত কারণে ভারতীয় সংবাদমাধ্যমে ভারতীয় ছিটবাসীদের নিয়ে খুব বেশি আগ্রহ পরিলক্ষিত হয়নি। তবে এই পর্বে ব্যতিক্রম বলতে গেলে কলকাতা থেকে প্রকাশিত ‘বর্তমান’ পত্রিকা। এই লেখকের ধারাবাহিক রচনা ‘ব্রাত্যজনের বৃত্তান্ত: প্রসঙ্গ ভারত-বাংলাদেশ ছিটমহল’ বর্তমান পত্রিকার দৌলতে পাঠকসমাজকে কিছুটা ধারণা দিতে প্রয়াসী হয়েছিল। তবে যেটা সব থেকে দুর্ভাগ্যের তা হল, একদা দেশীয় রাজ্য কোচবিহারের এই সকল বিচ্ছিন্ন ভূভাগের মানুষরা স্বাধীনতার দশকের পর দশক ধরে যে অবর্ণনীয় পরিস্থিতির শিকার হয়ে বসবাস করে চলল তা এক কথায় একবিংশ শতকে সভ্য সমাজের লজ্জা। তাদের অবস্থা যে অনেকটাই ‘জলে কুমির, ডাঙায় বাঘ’-এর মতো তা বলার অপেক্ষা রাখে না। *(শেষ)*

দেবব্রত চাকী

ধারাবাহিক কাহিনি

তরাই উৎরাই

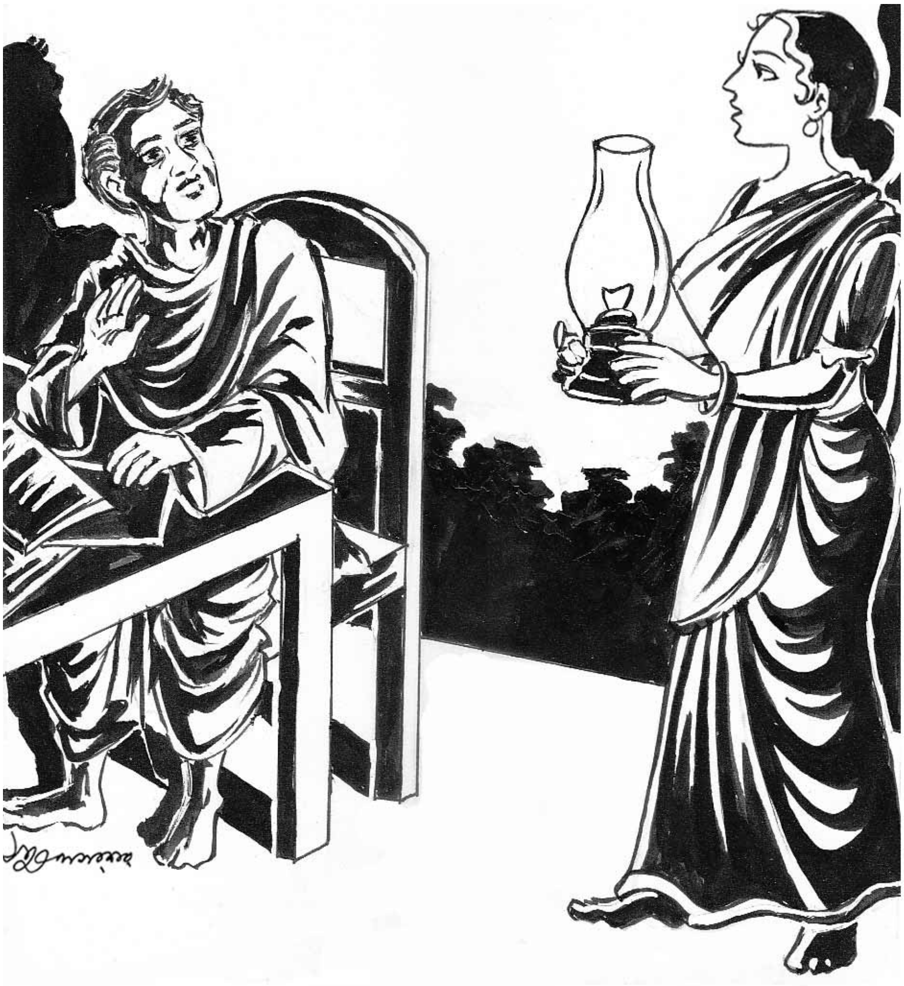

২৩

শীত পড়ে যাচ্ছে। সবে অঘ্রান, কিন্তু দুপুরবেলাটা বাদ দিয়ে গায়ে কিছু একটা না জড়িয়ে রাখলে খুদিদার বেশ শীত-শীত বোধ হচ্ছে। তিনি শীতকাতুরে নন। অন্যান্যবার পৌষ না এলে লেপের প্রয়োজন বোধ হত না খুদিদার। এবার মনে হচ্ছে আজকালের মধ্যেই সেটা বার করে রোদ্দুরে দিতে হবে। শীত যে জমিয়ে পড়েছে, এমন নয়। পাশের বাড়ির সুরেনবাবু তাঁর চাইতে বয়সে বড়— কিন্তু সে তো এখনও চাদর ছাড়াই সকাল-সন্ধে ঘুরে বেড়াচ্ছে। তাই খুদিবাবুর মনে হচ্ছে যে, তিনি অসুস্থ হয়ে যাচ্ছেন। বউকে সে কথা বলায় তিনি বলেছেন, ‘অসুখটা কী? জ্বর-সর্দি কিছুই তো লাগেনি। ম্যালেরিয়া হলে তো কাঁপুনি দিত।’

কথাটা সত্যি। খুদিদার বায়ু-পিত্ত-কফ তিনটেই স্বাভাবিক। রোগব্যাধি নেই বললেই চলে। তবে অঘ্রানের গোড়াতে এত ঠান্ডা লাগার কারণ কী? ছোকরা হলেও অবনী ডাক্তারের বেশ নামডাক শুনছেন কিছুদিন ধরে। তাঁকেই একবার দেখিয়ে আসবেন নাকি?

বেশ কিছুদিন হল ডাকে আসা বই-পত্রিকার মোড়ক খোলা হচ্ছে না। সন্ধের মজলিশে অন্যমনস্ক হয়ে যাচ্ছেন। গতকালই গয়েরকাটা চা-বাগানের শেয়ার কেনা উচিত কি না তা নিয়ে জোর তর্ক বেধেছিল বসার ঘরে। সে বিষয়ে তাঁর মত জানতে চাইলে খুদিদা উদাসীন সুরে বলে দিয়েছিলেন, ‘কী হবে শেয়ার কিনে? কে-ই বা খাবে! কে-ই বা দেখবে!’

শুনে মজলিশে সবাই থতমত খেয়ে চুপ করে গিয়েছিল মিনিটখানেকের জন্য। খুদিদা তখন টের পেয়েছিলেন যে, তাঁর শরীর মজলিশে থাকলেও মন ছিল অন্য কোথাও। কিছুদিন ধরেই হচ্ছে এমনটা। কাজে মন বসছে না। গল্প করতে করতে খেই হারিয়ে ফেলছেন। আসলে দুটো ব্যাপারে কারও সঙ্গে একটু পরামর্শ করতে পারলে খুদিদা একটু স্বস্তি পেতেন। কিন্তু পরিস্থিতি এমন হয়ে দাঁড়িয়েছে যে, দুটো ব্যাপারই বেশ গোপন রাখতে হচ্ছে। উপেনের কাজকর্ম নিয়ে একটা সন্দেহ তো প্রথম থেকেই ছিল। সেটা দিন দিন বাড়ছে। তিনি নিশ্চিত যে, উপেন মাসে একবার করে চিঠিতে যা লিখছে, সেসবই সাজানো ঘটনা। বছর ঘুরতে চলল সে বেরিয়েছে। এর মধ্যে একবার অন্তত তার জলপাইগুড়িতে আসা কি উচিত ছিল না? কলকাতাতেও কি একবার যাওয়া কর্তব্য ছিল না তার? টাউন থেকে দার্জিলিং মেলে কলকাতা তো এক রাতের পথ। উপেন যেটা করছে, সেটা প্রকাশ্যে করা যায় না বলেই সে আসছে না। আর সে কী করছে, সেটাও আর বুঝতে অসুবিধা নেই খুদিদার।

কিন্তু এ নিয়ে পরামর্শ করবেনই বা কার সঙ্গে? হিদারু নির্ঘাত কিছু জানে। সেও কেমন এড়িয়ে চলছে তাঁকে। গগনেন্দ্র আর হিদারু যে টাউনে ঘুরপাক খায়, সে সংবাদ তিনি নিয়মিত পান। সব চাইতে বড় কথা হল যে, দ্বিতীয় ব্যাপারটার সঙ্গে তো গগনেন্দ্র নিজেই জড়িয়ে। এখানেও খুদিদার মনে কোনও সন্দেহ নেই যে, শোভাকে মনে ধরেছে সে ছেলের। এবার বিয়েটা হওয়ানো দরকার। জামালদহে গগনেন্দ্রর

অন্দরমহলে মেয়েরা যে জোর গপ্পে মেতে উঠেছে, সেটা টের পেলেন। ঘরের ভেতর তখন অন্ধকার ঘনিয়ে আসছে। শোভা একটা আলো নিয়ে ঢুকল। তার মুখ-চোখ উজ্জ্বল। মনে হয় মজার কিছু নিয়ে গল্প করছিল ভিতরে। রেশটা থেকে গিয়েছে। খুদিদা মেয়ের মুখের দিকে তাকিয়ে হঠাৎ বেশ ফুর্তি পেলেন। সেই ফুর্তিতে শোভাকে বললেন, ‘একটা কথা বলতাম তোকে।’

বাবা রাজীবলোচনবাবুকে পত্র লিখে বিবাহ প্রস্তাব দেওয়ার সময় এসে গিয়েছে। এখানে গগনেন্দ্রর মতটা অবশ্য একবার জেনে নিতে হয়। রাজীববাবু যদি অমত করেন, তবে তাঁর ছেলেও সেটা করবে কি না জানাটা জরুরি। এ বাড়িতে গগনেন্দ্র মাসে একবার তো আসছেই। সে যদি বাবার অমতে বিবাহে রাজি হয়, তবে আলাদা উদ্যোগ নিতে হবে। তবে খুদিদার আশা যে, রাজীববাবু অমত করবেন না। লোকটি সম্পর্কে খবর আনিয়েছেন তিনি। খবর ভাল। মানী লোক।

এই দুটো ব্যাপারের কারণেই হয়ত শীতটা আগে থেকেই লাগছে এবার খুদিদার। বাড়িতে এখন লোকজন ভরতি। আত্মীয়স্বজন এসেছে। তিন-চার দিন থেকে যাবে কোচবিহারে রাসের মেলা দেখতে। খুদিদা কোচবিহারে যাননি কোনও দিন। সে বেশ সাজানো-গোছানো বড় একটা শহর। রাজার বিরাট প্রাসাদ। রাসের মেলায় লোক উপচে পড়ে। চিন্তার ব্যাপার দুটো না থাকলে খুদিদা হয়ত কোচবিহারেই চলে যেতেন মেলা দেখতে।

আশ্বিনের ম্লান বিকেল গড়িয়ে গিয়েছে। খুদিদা নড়েচড়ে বসলেন। বইপত্রের ঘরে একা একা খানিকক্ষণ বসে এসব ভেবে যাচ্ছিলেন এতক্ষণ। অন্দরমহলে মেয়েরা যে জোর গপ্পে মেতে উঠেছে, সেটা টের পেলেন। ঘরের ভেতর তখন অন্ধকার ঘনিয়ে আসছে। শোভা একটা আলো নিয়ে ঢুকল। তার মুখ-চোখ উজ্জ্বল। মনে হয় মজার কিছু নিয়ে গল্প করছিল ভিতরে। রেশটা থেকে গিয়েছে। খুদিদা মেয়ের মুখের দিকে তাকিয়ে হঠাৎ বেশ ফুর্তি পেলেন। সেই ফুর্তিতে শোভাকে বললেন, ‘একটা কথা বলতাম তোকে।’

শোভা চিন্তিত হয়ে পড়ল। বাবার সামনে টেবিলের উপর গা ঘেঁষাঘেঁষি করে তিনটে রবি ঠাকুরের বই পড়ে আছে। যদিও বাবা এখন রবীন্দ্রনাথের বই দেখলে শান্তই থাকে, কিন্তু তিন-তিনটে বই একটু বাড়াবাড়ি ঠেকছিল। বাবা কি বইগুলো পড়ার চেষ্টা করেছে? এমনিতে রবি ঠাকুরের বই বাবা ছুঁয়েও দেখে না। কিন্তু এই ঘরে সে বেশ খানিকক্ষণ হল আছে। তাই বই তিনটে উলটে দেখার সম্ভাবনা থেকেই যাচ্ছে।

তাই শোভা চুপ করে থাকল। আলোটা নামিয়ে রাখল টেবিলে।

‘বোস।’

খুদিদা বই তিনটের একটা সত্যি সত্যিই হাতে তুলে নিলেন। শোভা মুখোমুখি একটা মোড়ায় বসল।

‘রোজই ভাবি জিজ্ঞেস করব।’ খুদিদা এমনভাবে ‘মহুয়া’ গ্রন্থটি নাড়াচাড়া করতে লাগলেন যে, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর যেন কোনও নবীন লেখক এবং তিনি প্রথম তাঁর নাম দেখছেন। বই তিনটের মধ্যে যে একটা ‘মহুয়া’, সেটা শোভা আগে লক্ষ করেনি। সব বইয়ের মলাট একরকম হওয়াতেই তার গণ্ডগোলটা হয়েছিল। রবি ঠাকুরের উচিত বইয়ের মলাটগুলো আলাদা আলাদা করা। কৈলাসচন্দ্র বাগচি বলে একজনের লেখা একটা কবিতার বই আছে শোভার কাছে। নাম ‘রূপমুকুব’। সে বইটার মলাটটা কী সুন্দর রং দিয়ে ছাপা। অবশ্য কবিতাগুলো মোটেই ভাল লাগে না।

‘বড় হয়ে যাচ্ছিস দিন দিন। এটাই তো নিয়ম। তবে ছেলেদের বড় হওয়া আর মেয়েদের বড় হওয়ার মধ্যে তো পার্থক্য থাকে। তুই আমাদের একমাত্র সন্তান, তা-ই না?’

খুদিদা যেন নিজেকেই বলছেন, এমনভাবে বলে গেলেন কথাগুলো। শোভা বুঝতে পারল যে, বাবা ভূমিকা করছে। আসল কথাটা এখনও আসেনি। তাই উত্তর না দিয়ে চুপ করে রইল সে। খুদিদা অন্যমনস্কের ভঙ্গিতে ‘মহুয়া’ রেখে দিয়ে ‘মানসী’ তুলে নিয়ে পাতা ওলটাতে লাগলেন। শোভা ঠিক আন্দাজ করতে পারল না যে, বাবা কী বলতে চাইছে। খুদিদা পাতা ওলটাতে ওলটাতে এক জায়গায় থামলেন। তারপর প্রশংসার সুরে বললেন, ‘বাঃ! কবিতার নাম দেখছি ‘হিং টিং ছট’। রবিবাবু এসব পদ্য লেখেন নাকি?’

মিনিটখানেক ধরে একটা পাতা পড়ে আবার বললেন, ‘এটা তো খারাপ লাগছে না। রবিবাবুর কোনও শ্যামাসংগীত জানিস তুই?’

শোভা এবার জবাব দিল, ‘না।’

‘শুনেছি ওঁর টপ্পার সুরেও বাঁধা গান আছে। জানিস সেসব?’

শোভা এবার বাধ্য হয়ে বলল, ‘আসল কথাটা বলো না বাবা! আমি ভিতরে যাব।’

খুদিদা মেয়ের চোখের দিকে তাকিয়ে নরম স্বরে বললেন, ‘তোর বিয়েটা গগনেন্দ্রর সঙ্গেই দিয়ে দিই মা?’

‘ধ্যাৎ!’

সহসা অর্ধেক লাল হয়ে গেল শোভার মুখমণ্ডল। সে প্রায় লাফ দিয়ে বেরিয়ে গেল ঘর থেকে। খুদিদা সেই চলে যাওয়ার দিকে তাকিয়ে মিটিমিটি হাসতে লাগলেন। তারপর চেয়ারে শরীর এলিয়ে দিয়ে গভীর নিঃশ্বাস ফেললেন একটা। তাঁর মনে হল যে, এবার গগনেন্দ্রকে কথাটা বলতে পারলে সেও এমনটাই লজ্জা পাবে। তার বাবাকে আজ রাতেই চিঠি লিখবেন বলে মনে মনে ভেবে নিলেন খুদিদা। চিঠি লিখে বউকে দেখিয়ে রেখে দেবেন। গগনেন্দ্র এলেই তাকে প্রস্তাবটা দিয়ে সে চিঠি ডাকে ফেলে দেবেন তিনি।

ভাবতে ভাবতে একটু উত্তেজিত হয়ে চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ালেন তিনি। মেয়ে যখন, তখন বিয়ে তো দিতেই হবে। কিন্তু সেটা কেবল ভাবলেই চলবে না। বাস্তবে ঘটিয়ে ফেলতে হবে। আর বিয়ে ব্যাপারটা বললেই দেওয়া যায় না। কে না জানে যে, লাখ কথার কমে বিয়ে হয় না। শোভা তাঁর একমাত্র সন্তান। গগনেন্দ্রর সঙ্গে তার বিয়েটা ঈশ্বরের ইচ্ছা। এ বিয়ে হচ্ছেই।

খুদিদা আত্মবিশ্বাস ফিরে পেয়ে কেদার রাগের সুরে গুনগুন করে গাইতে লাগলেন ‘হিং টিং ছট, হিং টিং ছট’। উপেনের কথাটাও মনে চলে এল গাইতে গাইতে। তিনি ঠিক করলেন, পুলিশের সঙ্গে একটু যোগাযোগ করবেন। উপেন কোথায় আছে জানামাত্র তিনি তাকে তুলে নিয়ে আসবেন জলপাইগুড়িতে। তারপর বলবেন, ‘বোনের বিয়ের সব দায়িত্ব তো তোমার। এটা মিটলে তোমারও ব্যবস্থা হচ্ছে।’

ঘণ্টাখানেক পর দেখা গেল, বসার ঘরের সান্ধ্য মজলিশে অনেকদিন পর খুদিদা স্বমহিমায়। তাঁর বক্তব্যের বিষয় হল, ছেলেদের কংগ্রেস করার আগে বিয়ে করে ফেলা উচিত। উপস্থিত শ্রোতারা সে বক্তব্যে কিঞ্চিৎ আশ্চর্য হলেও খুদিদাকে ফর্মে ফিরতে দেখে কেউ আর প্রতিবাদ করল না। এমনকি এর পরে যখন তাঁরা খুদিদার মুখে রবি ঠাকুরের একটা কবিতার নাম শুনল, তখনও বিস্ময় প্রকাশ করল না বিন্দুমাত্র। বরং মেনে নিল যে, ‘হিং টিং ছট’ বলে একটা কবিতা রবি ঠাকুর লোকটা খারাপ লেখেননি।

পরদিন সকালে আর চাদরের দরকার হল না খুদিদার।

(ক্রমশ)

শুভ্র চট্টোপাধ্যায়

স্কেচ: সুবল সরকার

ডুয়ার্স থেকে দিল্লি

দেবপ্রসাদ রায়

৮

ব্যাঙ্গালোর অধিবেশনের ফলশ্রুতি হিসেবে কংগ্রেসের বিভাজনের কথা বলেছি। ইন্দিরাপন্থী অংশের নাম হল কংগ্রেস ‘আর’। অন্যটা কংগ্রেস ‘ও’, অর্থাৎ কংগ্রেস অর্গানাইজেশন। বিভাজনের পটভূমি তৈরি হচ্ছিল। যেটা প্রত্যক্ষ কারণ হিসেবে কাজ করল তা ছিল রাষ্ট্রপতি নির্বাচন। দলের প্রার্থী ছিলেন নীলম সঞ্জীব রেড্ডি। কিন্তু ইন্দিরাজি প্রার্থী দিলেন ভি ভি গিরিকে এবং আহ্বান রাখলেন ‘বিবেকের ভোট’ দেওয়ার জন্য। বলা বাহুল্য যে, ভি ভি গিরিই জিতলেন। এর পর দল ভাগ না হয়ে আর কোনও উপায় ছিল না।

আমি তখন রানিনগরের স্কুলের বদলে বেলাকোবার একটা হাই স্কুলে পড়াচ্ছি। সেটাও অবশ্য ডেপুটেশনে। দলভাগের খবর পেয়ে আমি, রাতুলদা (সরকার), কালী গুহ, মানদাক্ষী আর নয়াবস্তির বৈদ্যচরণ দত্ত রওনা দিলাম। শিলিগুড়ি জংশন থেকে ভোরবেলায় ট্রেন। সময়টা ’৬৯-এর বড়দিনের ছুটির কাছাকাছি। এখন নিয়ম হল যে, স্কুলে যে দিন ছুটি হচ্ছে আর যে দিন খুলছে, সে দু’দিনের মধ্যে একদিন উপস্থিত থাকতেই হবে। মানে সই থাকা চাই। নচেৎ ছুটির পুরোটাই আমার প্রাপ্য ছুটি থেকে কাটা যাবে। এর অর্থ মাইনে কাটা যাওয়া। দিল্লি যাত্রার কারণে দেখা গেল, ওই দু’দিনের কোনওটাতেই আমি থাকতে পারছি না। আমাদের হেডমাস্টার ছিলেন অজয় ঘোষ। তিনি আশ্বাস দিলেন এই বলে যে, তিনি বাড়িতে হাজিরার খাতা এনে রাখবেন। আমি যেন সই করে তারপর ট্রেন ধরি। সেইমতো ভোর সাড়ে চারটের সময় বেলাকোবা হাজির হয়ে তাঁকে ঘুম থেকে তুলে সই পর্ব সমাধা করে শিলিগুড়ির দিকে বেরিয়ে গেলাম আমরা।

অজয়বাবু সেই ছোট্ট উপকারটি না করলেও পারতেন। কিন্তু করেছিলেন বলে আজও মনে আছে। এইসব ছোট্ট ছোট্ট উপকার জীবনে অনেক শক্তি জোগায়।

আমরা বম্বে পৌঁছালাম। সেটা বম্বে অধিবেশনেরই সময়। গিয়ে দেখি ছাত্র পরিষদের অনেকেই হাজির। তার মধ্যে প্রিয়দা, সুব্রতদা, বাচ্চুদা, রায়গঞ্জের শংকর— এরাও। ফলে আমি সঙ্গী পেয়ে গেলাম। প্রিয়দার সে সময় সাংঘাতিক উদ্যম ছিল। বম্বে শহরের মোড়ে মোড়ে তিনি শংকরের কাঁধে চেপে মাইক ছাড়াই বাংলার রাজনৈতিক পরিস্থিতি নিয়ে বক্তৃতা দেওয়া শুরু করে দিলেন। বম্বের মতো শহরে মাইক ছাড়া কিছু বললে কে শুনবে? কিন্তু শ্রোতা নিয়ে প্রিয়দার মোটেই মাথাব্যথা ছিল না তখন।

খগেনবাবু হেরে যাওয়ায় নির্বাচনে সরকারে এসেছিল দ্বিতীয় যুক্তফ্রন্ট এবং তারা কংগ্রেসকে আরও নামিয়ে দিয়েছিল। দলের ভাগ্যে জুটেছিল মোটে ৫৫টা আসন।

যা-ই হোক। বম্বের আজাদ ময়দানে মূল অধিবেশন বসেছিল, আর এয়ার ইন্ডিয়ার বিল্ডিংটার সামনে আলাদা একটা প্যান্ডেলে হচ্ছিল যুব কংগ্রেসের সভা। নারায়ণ দত্ত তিওয়ারি যুব কংগ্রেসের কনভেনার তখন। টেকনিক্যালি আমরা যুব কংগ্রেসের ছিলাম না, ছিলাম ছাত্র পরিষদের। রাজ্যে তখন ‘যুব কংগ্রেস’ বলে কিছু যে ছিল, তা জানা ছিল না আমাদের। সুতরাং ছাত্র প্রতিনিধি হওয়া সত্ত্বেও প্যান্ডেলে ঢুকে

মুম্বই শহরের মোড়ে দলের কর্মীর কাঁধে চেপে মাইক ছাড়াই পশ্চিমবঙ্গের রাজনৈতিক পরিস্থিতি নিয়ে বক্তৃতা দিচ্ছেন কংগ্রেস নেতা। আজ ভাবতে গেলে সত্যিই অবাক হতে হয়। কিন্তু কংগ্রেস দল বিভাজনের পর এমন পরিস্থিতিরই সম্মুখীন হয়েছিল। গত শতকের সাতের দশক, মানে নকশাল আন্দোলনের রেশ কলকাতা শহরে বিশেষ করে আমহার্স্ট স্ট্রিট-কলেজ স্ট্রিটের উত্তাপ অনুভব করেছিলেন হ্যারিসন রোডের মেসবাড়িতে বসে। সেসব ঘটনা তো আছেই। পাশাপাশি নিজের দলের উত্থান-পতনের কথাও বলছেন স্বতঃস্ফূর্ত ভঙ্গিতে। ডুয়ার্স থেকে রাজধানী পথ পরিক্রমায় রাজ্য-রাজনীতি আর দিল্লির কার্যকলাপ জীবনধারাভাষ্য হলেও ক্রমশই যেন ঐতিহাসিক দলিল হয়ে উঠছে।

> বিজয় সিং নাহার বললেন, ‘গণতন্ত্র নিয়ে এত যে বললে, গণতন্ত্রের মানে জানো?’ সবিনয়ে জানালাম, ‘আমি একটি স্কুলে রাষ্ট্রবিজ্ঞান পড়াই। সময় পেলে গণতন্ত্র নিয়ে আমি ভালই বলতে পারি— একেবারে ম্যাকাইভার থেকে শুরু করে লিপসেট পর্যন্ত।’ সম্প্রতি একটি সভায় সে ঘটনার কথা উল্লেখ করে সুধীরবাবু বলছিলেন যে, আমি নাকি তখন থেকেই প্রতিবাদী স্বভাবের।

পড়লাম। কিন্তু উদ্যোক্তারা কিছুতেই প্রিয়দাকে বলতে দেবে না। অনেক চেঁচামেচি করে আমরা পাঁচ মিনিট আদায় করে নিলাম প্রিয়দার জন্য। প্রিয়দা দুর্দান্ত বললেন। ইংরেজিতে বলা সে বক্তব্য পাঁচের বদলে পঁয়তাল্লিশ মিনিটে দাঁড়াল। সে দিনের পর থেকেই জাতীয় রাজনীতিতে প্রিয়রঞ্জন দাশমুন্সীর পরিচিতি তৈরি হয়ে গেল। ওই মঞ্চ থেকেই প্রিয়দা রাজ্যে যুব কংগ্রেসের সভাপতিত্ব পেয়ে যান।

প্রিয়দা আমাকে বললেন, ‘চল মিঠু। কলকাতা ফিরে গিয়ে যুব কংগ্রেস করব।’

’৬৯ ফুরাতে আর দু’-একদিন বাকি তখন। প্রিয়দার প্রস্তাবে আমার ছাত্র পরিষদের পাঁচ বছরের সংক্ষিপ্ত জীবন ফুরিয়ে গেল। জলপাইগুড়িতে আমি তখন ছাত্র পরিষদের সম্পাদক হিসেবে গোটা দায়িত্বটাই সামলাচ্ছিলাম। সভাপতি নিত্যদা ছিলেন নামেই। তিনি টেকনিক্যালি নাইট কলেজের ছাত্র হলেও তাঁর বয়স হয়েছিল ছেচল্লিশ। সংগত কারণেই ছাত্র রাজনীতির উৎসাহ তাঁর অন্তরে সঞ্চারিত হওয়াটা খুব কঠিনই ছিল।

প্রসঙ্গত বলি যে, ছাত্র পরিষদে আমার যাত্রা শুরু হয়েছিল জয় দিয়ে। ক্লাস রিপ্রেজেন্টেটিভ হিসেবে জিতি। সেকেন্ড ইয়ারটা যায় মামলা করে। থার্ড ইয়ারে, মানে ’৬৭-তে যখন কংগ্রেস বেজায় সমালোচনার বস্তু, তখন কলেজে প্রোভাইস পদে দাঁড়িয়ে কমল বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাছে হেরে যাই মাত্র তিন ভোটে। আমি ভোট পেয়েছিলাম একশো পঁচাত্তরটি।

১৯৭০ শুরু হল যুব কংগ্রেস দিয়ে। প্রিয়দা আমাকে জলপাইগুড়ি যুব কংগ্রেসের কনভেনার করলেন। দলভাগের কারণে কমিটি, নেতৃত্ব— সবই নতুন। বিজয় সিং নাহার তৎকালীন প্রদেশ কংগ্রেসের অস্থায়ী সভাপতি, জলপাইগুড়িতে এলেন নতুন কমিটি করতে। শহরে তখন আমাদের তরফে শক্তিশালী নেতা ছিলেন পীযূষকান্তি মুখোপাধ্যায়। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে তাঁর সঙ্গে ছাত্র পরিষদের সম্পর্ক বেজায় তিক্ত। মাননীয় বরেন ভৌমিকের বাড়ির দোতলায় মিটিং হচ্ছিল। আমি সে মিটিং-এ উঠে দাঁড়িয়ে জানালাম যে, আমার কিছু বক্তব্য আছে।

অনুমতি পাওয়া গেল। আমি বললাম যে, গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়া মোটেই অনুসরণ করা হচ্ছে না। আলিপুরদুয়ার মহকুমার যাঁরা দলের হয়ে লড়ছেন, যাঁরা জ্যোতি বসুর সভা বন্ধ ডেকে পণ্ড করে দিয়ে দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন, তাঁদের কোনও প্রতিনিধি রাখা হচ্ছে না কমিটিতে। অতএব, এ মিটিং গণতান্ত্রিক নয়।

বিজয় সিং নাহার বললেন, ‘গণতন্ত্র নিয়ে এত যে বললে, গণতন্ত্রের মানে জানো?’

সবিনয়ে জানালাম, ‘আমি একটি স্কুলে রাষ্ট্রবিজ্ঞান পড়াই। সময় পেলে গণতন্ত্র নিয়ে আমি ভালই বলতে পারি— একেবারে ম্যাকাইভার থেকে শুরু করে লিপসেট পর্যন্ত।’ কমিটিতে অবশ্য আলিপুরদুয়ার থেকে সুধীরবাবু স্থান পেলেন। সম্প্রতি একটি সভায় সে ঘটনার কথা উল্লেখ করে সুধীরবাবু বলছিলেন যে, আমি নাকি তখন থেকেই প্রতিবাদী স্বভাবের।

যুব-র জেলা কনভেনার হয়ে আমি কাজ শুরু করেছিলাম। রাজ্য কমিটি হয়ে গেল। বিশু (বিশ্বরঞ্জন সরকার) রাজ্যে সহসভাপতি হল, এবং জলপাইগুড়ি যুব কংগ্রেসের সভাপতি আমাকে করা হবে— এটাও ঠিক হয়েছিল। কলকাতা থেকে সুদীপ এল জেলার কমিটি করতে। স্থানীয় শাহ ধর্মশালায় মিটিং ডাকা হল এই উপলক্ষে। আলিপুরদুয়ারের প্রতিনিধিরাও এলেন। কিন্তু বিশু গরহাজির। মিটিং চলতে থাকল। মোটামুটি জেলা সভাপতি হিসেবে আমি যখন প্রায় নিশ্চিত, তখন আচমকা আলিপুরদুয়ারের প্রতিনিধিরা দাবি জানাল যে, ভীষ্মদাকে সভাপতি করতে হবে। ব্যাপারটা অপ্রত্যাশিত ছিল। আমি কিঞ্চিৎ ধাক্কা খেলাম। সভাপতি নির্বাচন নিয়ে ভোটিং হতে পারে— এটা ধারণা ছিল না, তাই তৈরি হয়ে যাইনি। ফলে ভীষ্মদা সভাপতিত্ব পেয়ে গেল। সুদীপ আমাকে সান্ত্বনা দিয়ে বলল, ‘ঠিক আছে। তোমাকে আমি রাজ্য কাউন্সিলে নিয়ে নিচ্ছি।’

আমি সভাপতি না হওয়ায় প্রিয়দাও শক পেয়েছিলেন খানিকটা। কিন্তু যা হওয়ার তা হয়ে গিয়েছে। আমি পড়লাম কিছুটা বিড়ম্বনায়। কারণ, জেলা জানছে যে, আমি প্রদেশে কাজ করছি, আর প্রদেশ জানে আমি জেলার কর্মী। তাই ঠিক করলাম রাজ্য স্তরেই কিছু একটা করতে হবে। সে বছরই প্রিয়দা আমাকে যুব কংগ্রেসের একটা সম্পাদকের পদ দিলেন। এই পদটা পাওয়ার কারণে আমার কলকাতায় থাকার একটা যৌক্তিকতা তৈরি হল। কিন্তু সমস্যা হল, থাকব কোথায় কলকাতাতে?

মালদার অসিতদা তখন আমহার্স্ট স্ট্রিট আর হ্যারিসন স্ট্রিটের মোড়ে একটা মেসবাড়িতে থাকতেন তিনতলায়। সেখানে উত্তরবঙ্গের অনেক দলীয় কর্মী-নেতা গিয়ে উঠতেন। আমি সেটার কথাই ভাবলাম।

এর মধ্যে রাজ্যে নকশাল আন্দোলন ভয়ংকর চেহারা নিয়েছে। মনীষীদের মূর্তি ভাঙা চলছে। পরীক্ষা ভন্ডুল হচ্ছে। ব্যক্তি হত্যা শুরু হয়ে গিয়েছে। শহরে ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজে টানা আঠারো দিন ধরে লাল পতাকা উপরে ঝুলে থাকল। পুলিশের সাহস নেই যে গিয়ে সেটা নামিয়ে আনে। মেধাবী সব ছেলে জড়িয়ে পড়ছে এইসব ঘটনায়। এক কথায় একটা আতঙ্কের পরিবেশ। ’৬৯-এ যে দ্বিতীয় যুক্তফ্রন্ট গঠিত হয়েছিল তা সিপিএম-এর অত্যাচার আর তাণ্ডবের ফলে বাইশ মাসের মাথায় ভেঙে গেল। মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে অজয় মুখার্জি নিজের সরকারের বিরুদ্ধেই অনশনে বসেছিলেন তার আগে, কিন্তু সিপিএম-এর বাহিনী পচা ডিম আর টম্যাটো ছুড়ে সে অনশন মঞ্চে জবর হামলা চালায়। এর পরে অজয়বাবু পদত্যাগ করেন। ফলে রাজ্যপাল ধরমবীরার পরামর্শে রাজ্যে জারি হল রাষ্ট্রপতি শাসন।

সেটা ১৯৭১। সে এক অস্থির সময়। সিদ্ধার্থশংকর রায় রাজ্য কংগ্রেসের দলনেতা। রাজ্যে জনপ্রিয় কোনও সরকার গঠিত হচ্ছে না। নকশালদের উত্থান ঘটেছে উল্কার গতিতে। শিক্ষাব্যবস্থা চরম আতঙ্কের মুখে। প্রায়ই কানে আসছে নকশাল হানায় হত্যার খবর। ওই সময় কে জানি (সম্ভবত ইন্দ্রমিত্র) একটা কবিতায় লিখেছিলেন—

‘স্কুল কলেজে খিল, রাস্তায় মিছিল
ক্র্যাকারে কাঁপে রাজপথ, কিনু গোয়ালার গলি,
হীরের টুকরো ছেলেরা সব অশ্বমেধের বলি।’

(ক্রমশ)

আপনি কি ‘এখন ডুয়ার্স’-এ লিখতে চান?

আপনিও হতে পারেন ‘এখন ডুয়ার্স’-এর প্রতিবেদক। আপনার এলাকায় কোনও উৎসব, অনুষ্ঠান, মেলা হলে তা-ই নিয়ে প্রতিবেদন লিখে পাঠাতে পারেন। প্রতিবেদনটি যেন ২৫০ শব্দের মধ্যে হয়। সঙ্গে ছবি দিতে ভুলবেন না। লেখা পাঠান এই ঠিকানায়— **‘শ্রীমতী ডুয়ার্স’, প্রযত্নে ‘এখন ডুয়ার্স’, মুক্তা ভবন (দোতলা), মার্চেন্ট রোড, জলপাইগুড়ি- ৭৩৫১০১।**
ই-মেল- **srimati.dooars@gmail.com**

অসুস্থ হওয়াই জীবনের লক্ষণ

অর্ণব সেন
গল্প থেকে অণুগল্প

‘গল্প আগে, না অণুগল্প— বলা কঠিন। অণুগল্পের আয়তন কয়েক লাইন হতে পারে, আবার বড়জোর চারশো-পাঁচশো শব্দ পর্যন্ত যেতে পারে। ছোটগল্পের চেয়েও ছোট এবং অণুগল্পের সংক্ষিপ্ত পরিসরে ‘হঠাৎ আলোর ঝলকানি’র সৃষ্টি। এভাবেই এক বহুমাত্রিক বহুরৈখিক ব্যঞ্জনা আনা সম্ভব। আধুনিক ব্যস্ত গতিময় জীবনে অণুগল্প আবার ফিরে আসছে নতুন শক্তি নিয়ে। তবে গল্প থেকে অণুগল্প যেমন হয়, তেমনি অণুগল্প থেকেও হয় ছোটগল্প। দু’জনের সম্পর্ক নিবিড়।’— লেখক অর্ণব সেন বাংলা ছোটগল্প ও অণুগল্প সম্বন্ধে খুব সুন্দরভাবে এই কথাগুলি বলেছেন তাঁর সাম্প্রতিক গল্পগ্রন্থ ‘গল্প থেকে অণুগল্প’তে। বইটিতে ৭টি গল্প ও ২১টি অণুগল্প অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। অর্ণব সেন জলপাইগুড়িতে জন্মেছেন, তাই স্বাভাবিকভাবেই তাঁর গল্পগুলিতে বারবার ফিরে আসে জলপাইগুড়ি ও ডুয়ার্সের চিত্র-পটভূমি।

‘কলকাতায় পাহাড় ও সমুদ্র’ অণুগল্পটিতে অর্ণববাবু এত সুন্দরভাবে কলকাতার সমাজজীবনের আংশিক ছবি এঁকেছেন, যা অত্যন্ত ভাল লাগার। ‘সুখের অপেক্ষা’ ছোটগল্পে রয়েছে একটি অতি সাধারণ ঘটনা, যা জীবনকে বারবার আঘাত করে, একজন নারীর সুখের মুখ দেখার অধ্যবসায়। ‘বিপরীত হালদার’-এর মতো চরিত্র বাঙালি জীবনে ভূরি ভূরি এবং তাঁরা সর্বদাই কারও না কারও খোরাক হয়েই কাটিয়ে দেন জীবন। ভাল লাগে ‘সুখদুঃখের খাতা’র এই লাইনগুলো— ‘অসুস্থ হওয়াই জীবনের লক্ষণ। অসুস্থ না হইলে নিজের কথা মনে পড়ে না। সুস্থতা বড় ক্ষণস্থায়ী। সুখ বড় ক্ষণস্থায়ী। কিন্তু অসুস্থ হইলেই সুস্থ থাকার কথা মনে পড়ে।’

প্রতিটি ছোটগল্প ও অণুগল্পেই সমাজের বিভিন্ন দিককে বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে দেখানো এবং অপূর্ব ব্যঞ্জনায় সমস্যার বর্ণনা। প্রতিটি লেখাই ঝরঝরে, স্বাদু, সুপাঠ্য। বইটির প্রচ্ছদ করেছেন জয়ন্ত সি, যা নিঃসন্দেহে প্রশংসাযোগ্য। সব মিলিয়ে পাঠক আকর্ষণের ক্ষমতা রাখে এই গ্রন্থ।

গল্প থেকে অণুগল্প; অর্ণব সেন, দি সি বুক এজেন্সি, মূল্য ১০০ টাকা

রঙ্গন রায়

ছড়ার ভুবন থেকে কবিতার অঙ্গনে

এ সময়ের প্রায় সমস্ত ঘটনার উপরই একটা করে ছড়া। ছড়াকার শুভাশিস দাশ। সম্প্রতি তাঁর তিনটি বই পড়ার সুযোগ হয়েছে। ‘তির্যক ছড়া শতকিয়া’ বইটির ছড়াগুলির প্রত্যেকটিই কোনও না কোনও পত্রপত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে। যুগলবন্দি হিসেবে রয়েছে বিভিন্ন বিখ্যাত কার্টুনিস্টের আঁকা ব্যাঙ্গচিত্র। এরকমই আর একটি ছড়া ‘তেল পুড়িয়ে চড়েন গাড়ি/ মন্ত্রী এবং আমলাতে/ নাজিরবাবু ঝিমিয়ে পড়েন/ তেলের খরচ সামলাতে।’

তির্যক ছড়া
শতকিয়া
শুভাশিস দাশ

সঙ্গে কার্টুনিস্ট সুফির আঁকা ছবি। এখানেই বইটির বিশেষত্ব— যে বিষয়গুলো মানুষকে ভাবায়, সেইসব বিষয় নিয়েই তাঁর ছড়া। আপাতদৃষ্টিতে মজার মনে হলেও লেখাগুলিতে কবির সামাজিক দায়বদ্ধতা প্রকাশ পেয়েছে। বিদ্রুপাত্মক ভঙ্গিতে তুলে ধরেছেন সামাজিক অবক্ষয় ও চারিত্রিক অবনমনের চিত্রটি। তুলে ধরেছেন এখনকার রাজনৈতিক মূল্যবোধের অভাব। ‘দল ভাঙে চারিদিকে/ রাজনীতি ঘিরে/ ক্ষমতার লোভে কেউ/ দলে আসে ফিরে’। তবে শুধু যে ব্যঙ্গাত্মক ছড়াই লিখেছেন তা কিন্তু নয়। বইটিতে বন্দি আমাদের মন খারাপ, আমাদের আনন্দ। ‘সেই যে ব্যথা হারিয়ে যাওয়ার/ আজও বুকের মাঝে,/ তবুও ‘মদনমোহন’ নিয়ে রাসমেলাটা সাজে।’

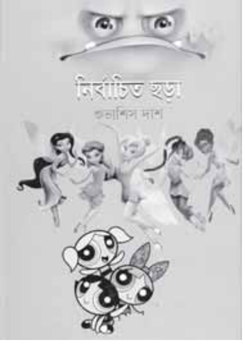

ছড়া লেখাতে তিনি বেশ সাবলীল, ‘নির্বাচিত ছড়া’ সংকলনটি তার উদাহরণ। বইটিতে ভিন্ন স্বাদের অনেকগুলি ছড়া স্থান পেয়েছে। কিছু কিছু নিছকই ছড়া, পড়ার আনন্দেই পড়ে ফেলা যায় এক নিঃশ্বাসে। পাঠকের মন সহজ ভাললাগায় পূর্ণ হয়ে যায়। ‘বনের মাঝে শেয়াল খুড়ো/ করেন বসে মাস্টারি/ পড়ান তিনি যেমন তেমন/ ভাঙেন চক ডাস্টার-ই’। আবার কিছু কিছু ছড়াতে উঠে এসেছে কবির সমাজসচেতনতা— ‘সহজ পাঠের পাঠ চুকিয়েই/ রিকশা চালায় হরি/ কেমন করে আজকে বলো/ তোমার পুজো করি?’

নির্বাচিত
প্রেমের কবিতা
শুভাশিস দাশ

‘নির্বাচিত প্রেমের কবিতা’ সংকলনটি ছড়াকার শুভাশিস দাশের অবশ্যই একটি অন্য পরিচয়। বইটিতে প্রেম-অপ্রেম ও সাধারণ জীবনবোধ মিলিয়ে বেশ অনেকগুলি কবিতাই সংকলিত হয়েছে। প্রথম কবিতাটিতে বাংলাদেশে ‘বোশেখ’ মানেই মাতৃভাষা আর রবীন্দ্রনাথের উপস্থিতি ব্যক্ত হয়েছে। এ হল বাঙালির মর্মবাণী। অন্যান্য কবিতার মধ্যে প্রতিফলিত কবির জীবনবোধ। ‘নষ্টমন’ কবিতাটি অথবা ‘মানুষের জন্য’, ‘ভালবাসার জন্য’, ‘নষ্ট স্বপ্নের কবিতা’, ‘কালবেলা’, ‘দিন যায় রাত যায়’ কবিতাগুলিতে কবির এ ধরনের অনুভূতি প্রকাশ পেয়েছে। বইটির মূল উপজীব্য বিষয় কিন্তু প্রেম। ‘এক আকাশ ভালবাসা দিলে/ আমি তোর পিছু নেব মৌরি,/ রোজ রাতে জোছনা শরীরে/ ভরিয়ে দেব জীবনের সমস্ত চাওয়ার ফুল’। এই ভালবাসার খোঁজ কিন্তু কবি পুরো বইটি জুড়েই করেছেন। তাই কবিতাগুলি পড়ার পর মনে হয়, কবি প্রেমকে দূর থেকে পর্যবেক্ষণ করেছেন, বুকে নিয়ে দেখেননি।

তির্যক ছড়া শতকিয়া; প্রিতম প্রকাশ, ঢাকা; মূল্য ১০০ টাকা/**নির্বাচিত ছড়া**; শব্দ প্রকাশনা, ঢাকা; মূল্য ৮০ টাকা/ **নির্বাচিত প্রেমের কবিতা**; শব্দ প্রকাশ; মূল্য ৫০ টাকা/শুভাশিস দাশ

শুক্লা রায়

ভাঙা আয়নায় টুকরো ডুয়ার্স

অনন্ত রেফার টিকিট এবং সুলভ ডেথ সার্টিফিকেট

লুনা চলে গেল। ভরা বসন্তে সে হুট করে পৃথিবীকে গুড বাই জানাল। সে বলত, লুনা মানে চাঁদ। আবার লুনা থেকেই লুনাটিক! লুনার আকস্মিক চলে যাওয়ার রক্তক্ষরণ বুক জুড়ে। সে বিখ্যাত কেউ নয়। বিখ্যাত কবির মেয়ে, অথচ কবিতা লিখত না। কবিতা শুনলে বলত, 'ও আমার কম্ম নয়!' কিন্তু এই মেয়েই আবার কবিতা শোনাতে বলত বারবার। কবিতা পড়লে তন্ময় হয়ে যেত। ঘরের বয়ামে রাখা কাজু-কিশমিশের কৌটায় হাত চলে যেত, ভাল কবিতার নজরানা।

লুনা বলত, 'ডুয়ার্সের পথ ধরে হারিয়ে যেতে ইচ্ছে করে। যদি তোমাদের মতো মোটরবাইক চালাতে পারতাম! আর যদি মেয়ে না হতাম!'

তার ইচ্ছে করত, যে পথ চা-বাগান চিরে ভুটানে গিয়েছে, ভুটান ছাড়িয়ে আরও উপরে, অজানায়, সেখানে যেতে। আমায় প্রায়ই বলত, 'নিয়ে যাবে আমায়? উত্তরের মেঘ ছোঁব।'

লুনা স্কুলে পড়াত। প্রাইমারি স্কুল। চা-বাগানের আদিবাসী ছেলেমেয়েরা পড়তে আসে সেখানে। অনর্গল সাদরি ভাষায় তাদের সঙ্গে কথা বলত। স্বপ্ন দেখত স্কুলটাকে দারুণ সুন্দর করে তুলবে। এখন তো ছুটির দিনেও ছুটি নেই। মিডডে মিল খাওয়াতে হয়। সে হাসিমুখে সেই কাজটা করত। রবিবার স্কুলে বসে ফোন করত। আর আমার শোনা হয়ে যেত অসংখ্য সাদরি বাক্য। কথা বলতে বলতে বাচ্চাদের সঙ্গে খুনসুটি! খেলার বল আটকে যাচ্ছে উপরে, লুনা পেড়ে দিচ্ছে! হোঁচট খেয়ে পড়েছে কেউ, লুনা আদর করছে! মারামারি, ঝগড়াঝাঁটি মেটাচ্ছে! আর রবিবারের খোলা ফোনে সেসব কথা ভেসে আসছে। লুনা বলছে, এরা খুব গরিব, কিন্তু খুব ভাল। ওদের বিনোদনও তো এই স্কুলেই, আমি এটাকে দারুণ করে বানাব দেখো! সাহায্য করবে না?

লুনা প্রায়ই হাসপাতালে যেত, ডাক্তারের কাছে যেত। নিজের জন্য নয়। অন্যকে নিয়ে। বলত, 'আমার ভাল লাগে কারও পাশে দাঁড়াতে।' কতজনকে কত পরামর্শ দিত। আর তার যখন কার্ডিয়াক অ্যারেস্ট হল, সে নিজেকে বাঁচাতে পারল না। বুকে তীব্র ব্যথা নিয়ে বীরপাড়া হাসপাতাল, সেখান থেকে শিলিগুড়ির বেসরকারি নার্সিং হোম। লুনা চোখ বুজল। দাঁড়াতে পারিনি তার বাবা-মা-ছেলে-ভাইয়ের সামনে। সাহস হয়নি। লুনা ছিল আদ্যোপান্ত একজন মানুষ, যে অন্যকে বাঁচবার দীপ্তি দিত। একা নয়, অনেককে নিয়ে চলবার শক্তি কীভাবে যেন স্বতঃস্ফূর্ত অর্জন করেছিল মেয়েটা। ভণ্ডামি ছিল না। সরাসরি কথা বলত। অথচ তাকে বাঁচাতে পারল না ডুয়ার্সের হাসপাতাল। বুকের মধ্যে মৃত্যুর তীব্রতা নিয়ে তাকে একশো কিলোমিটারের ওপারে বেসরকারি নার্সিং হোমে ছুটতে হল! বীরপাড়া থেকে শিলিগুড়ি।

ডুয়ার্সে এভাবেই মৃত্যু আসে। লুনার মৃত্যু আমার চোখের সামনে খুলে দিচ্ছে আরও অসংখ্য মৃত্যুর ডায়েরি। প্রিয়জনের নির্মম চলে যাওয়া।

গয়েরকাটা চা-বাগানের জয়। জয় ঘোষ। তরতাজা যুবক। বুকের যন্ত্রণার চিকিৎসায় দক্ষিণে গিয়ে পেসমেকার বসিয়ে ফিরল। সফল অপারেশন। দেখতে দেখতে যেন আগের চেয়েও সুন্দর হয়ে উঠল জয়। দেখা করতে গেলে হাসতে হাসতে বলল, 'আমি এখন খুব ভাল আছি। আগের চেয়েও।' সেই জয়ের ম্যালেরিয়া হল। স্থানীয় ডাক্তারকে বোঝানো গেল না সদ্য বড় সার্জারি হয়েছে তার। ভেবেচিন্তে ওষুধ দিতে হবে। তিনি তাঁর মতো চিকিৎসা শুরু করলেন, ইঞ্জেকশন দিলেন। জয় বমি করতে শুরু করল। হেঁচকি উঠছে সমানে। গাড়ি নিয়ে ছুট জলপাইগুড়ি। ৫৩ কিলোমিটার। রাস্তাতেই জয় চোখ বুজল।

> লুনা প্রায়ই হাসপাতালে যেত, ডাক্তারের কাছে যেত। নিজের জন্য নয়। অন্যকে নিয়ে। বলত, 'আমার ভাল লাগে কারও পাশে দাঁড়াতে।' কতজনকে কত পরামর্শ দিত। আর তার যখন কার্ডিয়াক অ্যারেস্ট হল, সে নিজেকে বাঁচাতে পারল না। বুকে তীব্র ব্যথা নিয়ে বীরপাড়া হাসপাতাল, সেখান থেকে শিলিগুড়ির বেসরকারি নার্সিং হোম। লুনা চোখ বুজল। দাঁড়াতে পারিনি তার বাবা-মা-ছেলে-ভাইয়ের সামনে।

গয়েরকাটার সাংস্কৃতিক স্তম্ভ ছিলেন বেণুদা, রণেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়। একটি ছোটদের স্কুল কী দুর্দান্তভাবে চালাতেন। ডুয়ার্স বলেই কি একটুও চিকিৎসার সুযোগ পাননি? কত কিছু করবার ছিল লোকটার। অথচ তাঁর বুকের যন্ত্রণারও কোনও উপশম হল না।

বীরপাড়া, ধূপগুড়ি, বানারহাট, ময়নাগুড়ি ইত্যাদি জনপদ কতটা অসহায়— বলে বোঝানো যায় না। হাসপাতালগুলিতে অপারেশন থিয়েটার, সার্জেন, অ্যানাস্থেটিস্ট ইত্যাদির অভাব। জাতীয় সড়কে প্রতিদিন দুর্ঘটনা আর মৃত্যুমুখী মানুষ। ডাক্তাররা কুশলী হাতে রেফার করবার ছাড়পত্র লেখেন। বেশ কিছু অ্যাম্বুলেন্স হয়েছে। তারা আধমরা রোগীকে নিয়ে জলপাইগুড়ি, শিলিগুড়ি, মেডিক্যাল কলেজে ছোটে। সেখানে ডেথ সার্টিফিকেট লেখা হয়! পথে নিত্য জ্যাম। হিমঘরে আলু ঢোকানোর গাড়ির মিছিল। পথ আটক। ভাঙাচোরা জলঢাকা ব্রিজে ট্রাক ফেঁসেছে। পথ আটক। সাইকেল না পাবার ক্ষোভে জাতীয় সড়কে আন্দোলন। পথ আটক!

চা-বাগানময় ডুয়ার্সের অবস্থা তো আরও করুণ। দিন দশেক আগে চামুর্চি যেতে যেতে দেখছিলাম চা-বাগানের বন্ধ হাসপাতাল শূন্য হয়ে পড়ে আছে। বারান্দায় কিছু ছেলের আড্ডা, তাস খেলা, বিড়ি ফোঁকা। অথচ ক'বছর আগেও কী ঝকঝকে ছিল হাসপাতালটি। রমরম করত। সবুজের মাঝখানে কর্মব্যস্ত হাসপাতালটি দেখতেও কী ভাল লাগত। আদিবাসী মানুষগুলোর ভরসার ঠিকানা ছিল। লুনার জন্য, জয়ের জন্য তবু অ্যাম্বুলেন্স ছুটেছিল। ওদের কী হবে?

লুনা বলত, 'আমি মানুষের পাশে আরও বেশি করে দাঁড়াতে চাই।' জয় বলত, 'এবার আমি আরও বেশি করে কবিতা লিখব।' বেণুদা বলতেন, 'অনেক কিছু করবার আছে জানো!'

আমরা কিন্তু কিচ্ছু করতে পারিনি।

আমরা বারবার বঞ্চনার কথা বলব। কখনও তা স্লোগানের মতো শোনাবে। আমাদের নিয়ে কত রাজনীতি হবে। কিন্তু ক্যানভাসটা বদলায় না। সুগম ডুয়ার্স, দুর্গম ডুয়ার্স, সার্বিক ডুয়ার্স প্রতিদিন মৃত্যুর সঙ্গে ঘরকন্না করে। এবং তার সিংহভাগে অসময়ের অসহ্য মৃত্যু।

পথিক বর

ডুয়ার্সের মেগাসিরিয়াল। ৮

লাল চন্দন নীল ছবি

অরণ্য মিত্র

কুমারগ্রাম থেকে মেরুন রঙের মারুতি ভ্যানটা ছুটতে ছুটতে মাদারিহাট পেরিয়ে বীরপাড়া-ফালাকাটা হয়ে শিশুবাড়িতে থামল। গাড়িতে সবুজ প্যান্ট আর খয়েরি সোয়েটার পরা লোকটার মুখ অর্ধেক ঢাকা মাফলারে। এ ধরনের লোকজনই এখন ডুয়ার্সে ঘন ঘন যাতায়াত করছে। কারণ নদী জঙ্গল ঘেরা ডুয়ার্স এখন ক্রাইম দুনিয়ার নন্দনকানন। টুরিস্টদের রিসর্ট থেকে শুরু করে বিভিন্ন এনজিওতে কাজ করা মেয়েরাও বেশি টাকার লোভে অপরাধ জগতের চৌকাঠ অনায়াসে পেরোচ্ছে প্রায় রোজই। এখানে নীল ছবির শুটিংয়ে যোগ দিচ্ছে বাংলাদেশ আর পাকিস্তান থেকে আসা গোলগাল শরীরের মেয়েরা। সেই ছবি পাড়ি দিচ্ছে বিদেশে। ব্যবসায়ী, রিসর্ট মালিক, রাজনৈতিক নেতা—প্রায় সবাই যুক্ত ওই ব্যবসায়।

২২

কুমারগ্রাম থেকে মেরুন রঙের মারুতি ভ্যানটা ছোটা শুরু করেছে কাকভোর থেকে। সকাল ন'টা পর্যন্ত জাতীয় সড়কে ট্রাকের ভিড় প্রায় থাকে না বললেই চলে। ফলে তাড়াতাড়ি ছোটা যায়। গাড়িটা প্রথমে যাবে মাদারিহাট পেরিয়ে শিশুবাড়ি বলে একটা জায়গায়। সেখানে একটা ছোট গ্যারেজের সামনে অপেক্ষা করবে একজন। মারুতি চালক চঞ্চল থাপা সেই 'একজন'-এর নাম জানে না। চেনেও না। শুধু এইটুকু জানে যে, অপেক্ষমাণ লোকটির মাথায় থাকবে নীল রঙের উলের টুপি। তাকে তুলে নেওয়ার পর সে গাড়ি চালিয়ে বীরপাড়া-ফালাকাটা হয়ে ধরবে কোচবিহারের রাস্তা। পথে নিশিগঞ্জ বলে একটা গঞ্জ আছে। সেই গঞ্জটি হাড়ভাঙার চিকিৎসার জন্য বিখ্যাত। গাছের পাতা দিয়ে হাড় জোড়া দেওয়ার জন্য নিশিগঞ্জের বদ্যিদের বেশ নামডাক আছে। অবশ্য চঞ্চল থাপা সেখানে হাড়ের চিকিৎসার জন্য যাবে না। সুখান লাকড়া সেখানেই থাকবে। নীল টুপির সঙ্গে সুখান লাকড়াকে মিলিয়ে দেওয়াই চঞ্চল থাপার দায়িত্ব। আর এই দায়িত্বপালনের নির্দেশ এসেছে খোদ দাসবাবুর কাছ থেকে।

এখন সাড়ে ছ'টার মতো বাজে। শীতের কোনও ঘাটতি নেই আবহাওয়ায়, তবে সকালটা আজ পরিষ্কার। কুয়াশা থাকলে এত তাড়াতাড়ি হাসিমারা পার হতে পারত না চঞ্চল থাপা। থার্টি-ওয়ান সি জাতীয় সড়ক প্রায় ফাঁকা। চঞ্চল থাপা অ্যাক্সিলেটরে চাপ দিয়ে স্পিডোমিটারের কাঁটা আশিতে তুলে দিল। সাতটার মধ্যে শিশুবাড়ি থেকে নীল টুপিকে তুলে নিতে পারলে ন'টার আগেই নিশিগঞ্জ পৌঁছে যাওয়া যাবে।

সময়ের হিসেবটা মনে মনে কষে নিয়ে চঞ্চল থাপা তোর্সা সেতু পেরিয়ে দক্ষিণে বাঁক নিল। তখনই বেজে উঠল তার মোবাইল। গাড়ির গতি কমিয়ে চঞ্চল থাপা ফোনটা ধরতেই শুনল বিজু প্রসাদের গলা, 'এখন কোথায়?'

'মাদারিহাটের কাছে।'

'গুড। শিশুবাড়ির কাছাকাছি এসে ডান দিকে লক্ষ রাখবে। গ্যারেজের সামনে একটা ছোট কালভার্ট আছে।'

'ওকে।'

'নীল টুপিকে দেখলে বলবে কোড বলতে।'

'কোড?'

'হ্যাঁ। কোড হল চেচাখাতা। সে নিজেই বলবে।'

ফোন কেটে গেল। চঞ্চল থাপা আবার গাড়ির গতি নিয়ে গেল আশিতে। ঝড়ের বেগে গাড়িটা ছুটতে শুরু করল প্রথম গন্তব্যের দিকে। শিশুবাড়িতে উদ্দিষ্ট গ্যারেজের সামনে সে যখন দাঁড়াল, তখন ঘড়ির কাঁটা সাতটা ছাড়িয়েছে মাত্র। চঞ্চল থাপা লক্ষ করল, কালভার্টের ঠিক উপরে দু'পকেটে হাত ঢুকিয়ে একজন স্বল্প উচ্চতার মানুষ একদৃষ্টে তার গাড়িটাকে দেখছে। কালো মাফলারের উপর নীল টুপি পরে আছে সে।

চঞ্চল থাপা গাড়িটা কালভার্টের উপরেই থামাল। লোকটি ধীরপায়ে ড্রাইভারের জানালার পাশে এসে নিচু গলায় বলল, 'চেচাখাতা।'

দ্বিরুক্তি না করে পিছনের দরজাটা খুলে দিল চঞ্চল থাপা। লোকটার হাইট খুব বেশি

কিন্তু মাঝেমধ্যে দু'-একজন পোড়খাওয়া টুরিস্ট মুচকি হেসে বলে, 'তা-ই বুঝি? তাহলে রিসর্টের রং এত চকচকে কেন? এইরকম হলুদ রং তো গভীর অরণ্য থেকে গন্ডারের চোখে পড়ে যাবে!' দীননাথ তখন বলে, 'রাইট সার। মালিক বলেছেন উনি নেক্সট মান্থে রিসর্টের কালারটা ব্লাইন্ড বানিয়ে দেবেন।'

হলে পাঁচ তিন হবে। সবুজ প্যান্ট আর খয়েরি সোয়েটার। মুখের অর্ধেকটা মাফলারে ঢাকা। ঘোলাটে দৃষ্টির সরু চোখের দিকে এক পলক তাকিয়ে চঞ্চল থাপা গাড়ির গিয়ার বদলাল। নীল টুপিকে কিছু জিজ্ঞেস করার হুকুম নেই। সে যদি কোথাও থামতে চায়, তবে গাড়ির পরের স্টপ হবে নিশিগঞ্জ। চঞ্চল থাপা মনে মনে খানিকটা কৌতূহল নিয়েই বীরপাড়ার দিকে গাড়ি ছোটাল। বাইরে ঝলমলে রোদ্দুর। আকাশ পরিষ্কার থাকায় শীতের কনকনে ভাবটা জব্বর হয়েছে। আয়না দিয়ে চঞ্চল থাপা লক্ষ করল যে, সেই ঠান্ডাতেও নীল টুপি জানলার কাচ খানিকটা নামিয়ে দিয়েছে।

ন'টার একটু আগে আগেই নিশিগঞ্জ দেখা গেল। রাস্তার দু'পাশের দোকানগুলোর অধিকাংশ তখনও খোলেনি। চঞ্চল থাপা চারদিক দেখতে দেখতে চালাচ্ছিল গাড়িটা। সুখান লাকড়া কোথায় থাকবে, সে বিষয়ে কোনও তথ্য নেই তার কাছে। অবশ্য খুঁজে পেতে অসুবিধা হল না। একটা খাবারের দোকানের সামনে দাঁড়িয়ে সুখান লাকড়া খবরের কাগজ ওলটাচ্ছিল। গাড়িটাকে দেখে হাত নাড়াল সে। চঞ্চল থাপা গাড়িটা থামিয়ে জিজ্ঞাসু চোখে তাকাল তার দিকে। কিন্তু সুখান লাকড়া তাকে পাত্তা না দিয়ে সোজা গাড়ির পিছনের দরজার সামনে এসে নীল টুপিকে বলল, 'আমি সুখান লাকড়া। আসুন।'

নীল টুপি কোনও কথা না বলে গাড়ি থেকে নামল।

'গাড়িটা নিয়ে ওয়েট করো। আমরা আসছি।'

চঞ্চল থাপার উদ্দেশে কথাটা বলে সুখান লাকড়া হাঁটা শুরু করল। নীল টুপি তাকে অনুসরণ করছে। সামনেই একটা তেঁতুল গাছ। তার গা ঘেঁষে একটা কাঁচা রাস্তা চলে গিয়েছে ভিতর দিকে। সুখান লাকড়া সেই রাস্তাটা ধরল। ফুট তিরিশেক হাঁটার পর মুলি বাঁশের বেড়া দিয়ে তৈরি একটা কুড়ি বাই দশ ফুটের ঘর। পলিথিন শিটের চাল। ডুয়ার্সের হাটেবাজারে এমন দোকান খুবই সাধারণ। দোকানটা 'ভাতের হোটেল' নামে পরিচিত হলেও সেখানে বসে বাংলা মদ পান করা যায়। অবশ্য মদ্যপানের ব্যাপারটা আনঅফিশিয়াল। সুখান লাকড়া দোকানে ঢুকে একদম শেষের বেঞ্চিটাতে বসল। নীল টুপি বসল তার মুখোমুখি।

'একটায় হবে?' সুখান লাকড়া নিচু গলায় জানতে চাইল।

'আগে তো ঠান্ডাটা কাটুক।' নীল টুপি ঘড়ঘড়ে গলায় উত্তর দিল, 'তোমার প্ল্যানটা কি এখানেই বলবে?'

'জায়গাটা সেফ।' দোকানের মালিককে ইশারায় একটা বোতলের হুকুম দিয়ে বলল সুখান লাকড়া। মালিকটি মহিলা। বয়স হয়েছে। সম্ভবত বিহারি। সে দোকানের পিছন থেকে একটা বোতল আর দুটো গ্লাস ওদের সামনে নামিয়ে চলে যেতেই নীল টুপি বলল, 'দাসবাবুর কাজ আগেও করেছি। ঝামেলা নেই। পেমেন্টের ব্যাপারটা কিন্তু তিন।'

'সে আমার সঙ্গেই আছে।' গেলাসে একটা চুমুক দিয়ে বলল সুখান লাকড়া, 'পুরোটাই আগাম দেওয়ার হুকুম আছে।'

'ফাইন!' একটু হেসে নিজের গেলাসটা ফাঁকা করে ফেলল নীল টুপি। তারপর সরাসরি সুখান লাকড়ার চোখের দিকে তাকিয়ে বলল, 'কাজটা কোথায়?'

'সোনারপুরের কাছে। টার্গেটকে আজই চিনিয়ে দেব। শুনেছি শার্প শুটার হিসেবে তোমার বেশ নাম আছে!'

নীল টুপি এই প্রশংসাবাক্যে কেবল মুচকি হাসল। হাসিটাও তার ঠান্ডা। খুব ঠান্ডা। সুখান লাকড়া সামান্য শিউরে উঠল সেই হাসি দেখে।

২৩

দীননাথ চৌহানের মূল সমস্যা দুটো। প্রথমটার জন্য অবশ্য তাকে দায়ী করা যায় না। সে লোকনাথ রিসর্টের ম্যানেজার কাম টুরিস্ট গাইড। কিন্তু রিসর্টের মালিক গাবু সরকার বেজায় কিপটে লোক। এই কিপটেমোটাই প্রধান সমস্যা দীননাথ চৌহানের। এনজেপি স্টেশন থেকে টুরিস্টদের রিসর্টে নিয়ে আসার জন্য গাবু সরকারকে সে অনেকদিন ধরেই বলে আসছে একটা ভাল গাড়ির কথা। কিন্তু মালিক কিছুতেই তার পুরনো অ্যাম্বাসাডরটা পালটাবে না। অন্য রিসর্ট থেকে আসা ঝাঁ চকচকে গাড়িগুলোর পাশে নিজেদের এই ঝরঝরে গাড়িটা নিয়ে দাঁড়াতে বড়ই লজ্জা লাগে দীননাথের। বেড়াতে আসা টুরিস্টরা গাড়িটা দেখে পাঁচন গেলার মতো মুখ করে জানতে চায়, 'কী দাদা! আপনাদের রিসর্টটাও এমন নয় তো?'

দীননাথকে তখন প্রচুর চেষ্টা করে বোঝাতে হয় যে, লোকটার রিসর্ট হল এলাকার এক নম্বর রিসর্ট। একবার গিয়ে পৌঁছালে গাড়ির কথা মনেই থাকবে না।

কথাটা অবশ্য সত্যি। লোকটার রিসর্ট বেশ সাজানো একটা ব্যাপার। জায়গাটাও চমৎকার। কিন্তু সেখানেও আবার খানিকটা কিপটেমো করে রেখেছে তার মালিক। বিছানার চাদর আর ঘরের পর্দাগুলো খুবই সস্তার মাল। এমনিতে পরিষ্কার করে কাচা, কিন্তু রং উঠে ফ্যাকাসে। এর কারণ বোঝাতে গিয়ে আবার আরও অনেক কথা বলতে হয় দীননাথকে। সে বোঝায় যে, ফরেস্টের কাছাকাছি চকচকে রঙের কিছু রাখতে নেই। জন্তুরা ঘরে চলে আসতে পারে। নেহাত তাদের রিসর্ট তেমন বিলাসবহুল কিছু নয়। যাঁরা আসেন, তাঁদের অধিকাংশই বাঁশবন দেখলে গভীর অরণ্য ভেবে ভুল করেন, আর ময়ূর দেখলে মূর্ছা যান— তাই দীননাথের যুক্তিও মেনে নেয় বিনা প্রতিবাদে। কিন্তু মাঝেমধ্যে দু'-একজন পোড়খাওয়া টুরিস্ট মুচকি হেসে বলে, 'তা-ই বুঝি? তাহলে রিসর্টের রং এত চকচকে কেন? এইরকম হলুদ রং তো গভীর অরণ্য থেকে গন্ডারের চোখে পড়ে যাবে!'

দীননাথ তখন বলে, 'রাইট সার। মালিক বলেছেন উনি নেক্সট মান্থে রিসর্টের কালারটা ব্লাইন্ড বানিয়ে দেবেন।'

এটাই দীননাথের দ্বিতীয় সমস্যা। ইংরেজিটা কিছুতেই তার রপ্ত হয় না। অথচ ইংরেজি না বললে ম্যানেজার হওয়া মুশকিল। পোড়খাওয়া পর্যটক কালার ব্লাইন্ড ব্যাপারটা বুঝতে না পেরে তার দিকে অবাক চোখে তাকালে সে বলতে চায় যে, পরের বার এলেই দেখবেন রং বদলে গিয়েছে। কিন্তু ইংরেজির প্রতি দুর্বলতা হেতু দীননাথ বলে, 'নেক্সট কালার চেঞ্জ রিসর্ট উইল সি সার!'

গাবু সরকার অবশ্য দীননাথের ইংরেজি শুনলেই তেলে-বেগুনে জ্বলে ওঠেন। আজ দুপুরে এনজেপি-তে তিনজন টুরিস্ট নামবে। হাওড়ার একটা পরিবার। লোকনাথ রিসর্টে দু'দিন থাকবে। ট্রেন এনজেপি-তে আসবে দুটো নাগাদ। দীননাথ গাড়ি নিয়ে এগারোটার মধ্যে বেরিয়ে পড়বে বলে ঠিক করা আছে। এখন বাজে সাড়ে দশটা। ঘণ্টাখানেক আগে যে দু'জন টুরিস্ট রিসর্টে ছিল, তারা অটো ভাড়া করে গয়েরকাটা চলে গিয়েছে। গাবু সরকার চেয়েছিলেন দীননাথ ওদের গয়েরকাটায় পৌঁছে দেবে। এতে কিছু রোজগার হত। কিন্তু দীননাথ রাজি হয়নি। এনজেপি যেতে দেরি হবে বলেই রাজি হয়নি সে। এতে গাবু সরকার কিঞ্চিৎ চটে ছিলেন। তাই দশটা পঁয়ত্রিশে দীননাথ বাইক নিয়ে রিসর্টের সামনে আসতেই তিনি একটু উষ্মার সুরে বললেন, 'ঘণ্টাখানেক আগে এলেই তো ভাড়াটা মারতে পারতে দীনু! দু'জনেরই দুটো পয়সা হত!'

‘তা তো হত!’ দীননাথ বাইক দাঁড় করিয়ে বলে, ‘আখুন কন্সিডার করবেন যে, কাস্টমার কন্টিনিউ বোরিং ইন এনজেপি।’

‘বাজে কথা বোলো না তো! গয়েরকাটা যেতে বিশ মিনিটও লাগে না।’

‘আই নট লাইক টেনশন ওয়ার্কিং।’

‘বালের ইংরেজি বলবি না তো!’ গাবু সরকার ধমকে ওঠেন, ‘হিন্দিটা তো তোর নিজের ভাষা! সেটাই বল না!’

‘টকিং ইংলিশে মিসটেক ধরছেন কেন?’

গাবু সরকার রেগে আটটা হয়ে আরও কিছু বলতেন। কিন্তু একটা অটো এসে রিসর্টের গেটে থামায় তিনি সামলে নিলেন। একজন আরোহী নেমেছে অটো থেকে। পিঠে ব্যাগপ্যাক। কালো জ্যাকেটটা হাতে ঝোলানো। মাঝারি উচ্চতার লোকটা গেট পেরিয়ে তাঁদের দিকেই এগিয়ে আসছে।

‘ওয়েলকাম সার। আই ম্যানেজার দীননাথ চৌহান।’

ইংরেজিটা মোটামুটি ঠিক হওয়ায় গাবু সরকার কিছু বললেন না। আগন্তুক একটু হেসে বলল, ‘মে আই গেট আ রুম?’

‘শিয়োর গেট সার। ওয়ান লাক্সারি রুম গেট সার। ওয়ান থাউজেন্ড রুপিজ।’

‘ফাইন। আমি তিন দিন থাকব।’

বুকিং বিনা এমন কাস্টমার ন’মাসে-ছ’মাসে পেয়ে থাকেন গাবু সরকার। সাতশো টাকার রুম হাজার টাকা চার্জ করেন তখন। কিন্তু সেসব কাস্টমার একদিনের বেশি থাকে না। সেখানে তিন দিনের কথা শুনে গাবু সরকারের মুখে চওড়া হাসি ফুটল। তিনি বললেন, ‘আমাদের ম্যানেজার যখন বলে ফেলেছে হাজার টাকা, তখন সেই রেটটাই দেবেন। এমনিতে লাক্সারি রুম আমরা বারোশোর নিচে দিই না।’

আগন্তুক ধীরপায়ে গাবু সরকারের কাছে এসে ফিসফিস করে বলল, ‘শুনেছি আপনার এখানে কাগজপত্র না দেখালেও চলে। আমার কিন্তু ভোটার কার্ড নেই।’

‘দেন সার টুয়েল্‌ভ হান্ড্রেড। এক্সট্রা টু হান্ড্রেড ফর পুলিশ ম্যানেজ।’

আপ্লুত গাবু সরকার এবার নিজেই ইংরেজি বলে ফেললেন।

২৪

রুপালি কন্যাসাথি এনজিও-র কাশিয়াগুড়ি অফিস থেকে একটু দূরে একটা পলাশ গাছের নিচে অপেক্ষা করছিল। এখন দেড়টা বাজে। আলিপুরদুয়ার যাওয়ার বাস ধূপগুড়ি থেকে সাড়ে তিনটের মধ্যে ধরতে পারলেই সে সন্ধের মধ্যে বাড়ি পৌঁছে যাবে। এই নিয়ে তিন দিন কন্যাসাথিতে এল রুপালি মুন্ডা। প্রথম দিন সতু বিশ্বাস এসেছিলেন সঙ্গে। পরের দু’দিন একাই আসছে। এমনিতে কোনও অসুবিধা নেই। কন্যাসাথির দিদিরা খুব ভাল। লাবনি দাস প্রথম দিন নিজে হাজির থেকে কর্মীদের বুঝিয়ে দিয়েছিলেন রুপালির অবস্থাটা। ট্রেনিং অবশ্য শুরু হয়নি। লাবনিদি বলেছেন কয়েকদিন আসতে। নিয়মিত এলেই অনেক কিছু বুঝতে পারবে রুপালি। সপ্তাহে তিন দিন আসতে হবে। কন্যাসাথি থেকে মিনিট পনেরো আগে বেরিয়েছে রুপালি। সে দাঁড়িয়ে আছে সুরজের জন্য। সুরজ ধূপগুড়িতে থাকে। আগের দিন আলাপ হয়েছে রুপালির সঙ্গে। লাবনিদির চেনা ছেলে। কাশিয়াগুড়ি টু ধূপগুড়ি রুটে টোটো চলে। ভাড়া কুড়ি টাকা। বাসে এলে অবশ্য লাগে আট টাকা। কিন্তু দুপুরের দিকে বাস কম থাকে বলে রুপালি প্রথম দিন সতু আঙ্কলের সঙ্গে টোটোতেই ফিরেছিল ধূপগুড়ি। আগের দিনও তা-ই করবে কি না ভাবছিল যখন, তখন লাবনিদি বলে সুরজের কথা। কন্যাসাথিতে মেয়েদের দিয়েই বেশির ভাগ কাজ করানো হলেও সুরজকে দরকার হচ্ছে অন্য কারণে। ধূপগুড়িতে কী একটা প্রজেক্ট চলছে। সুরজ সেই প্রজেক্টের কাগজপত্র নিয়মিত নিয়ে আসে-যায় কাশিয়াগুড়ি থেকে। তার একটা বাইক আছে।

‘টোটো ভাড়া বেঁচে যাবে তোমার। সুরজ ভাল ছেলে। পরিশ্রম করতে পারে। তুমি ফেরার সময় ওর বাইকেই ফিরো।’ রুপালিকে বলেছিলেন লাবনি দাস।

একদিনই রুপালি ধূপগুড়ি ফিরেছে সুরজের বাইকে। সুরজ বাঙালি নয়। কিন্তু কথা শুনে বোঝা যায় না সেটা। সে অনর্গল কথা বলতে পারে। সেসব কথা বেশ মজার। রুপালির শুনতে ভালই লেগেছিল আগের দিন। সব চাইতে বড় কথা, তাকে বাইকের পিছনে বসিয়ে সুরজ কোনও অসভ্যতা করেনি।

অনেকদিন হল বৃষ্টি নেই। শুকনো শীতের হাওয়ায় ধুলো ভরতি গাছগুলো অল্প অল্প দুলছিল। কন্যাসাথি থেকে রুপালিকে একটা কাপড়ের সাইড ব্যাগ দেওয়া হয়েছে। ব্যাগটা কাঁধে ঝুলিয়ে রুপালি গাছগুলোর দোলা দেখছিল একমনে। তার মনে এখন অপূর্ব একটা আনন্দ। জলপাইগুড়িতে হস্টেল জীবন শুরু হলে সে মাসে বেশ কিছু টাকা পাবে। সেই টাকা জমিয়ে কাকে কী দেবে, সেটাই ভাবছিল রুপালি। আলিপুরদুয়ার থেকে কাশিয়াগুড়ি যাতায়াতে প্রায় দেড়শো টাকার মতো খরচ। সপ্তাহে তিন দিন হলে মাসে কত হয়? হস্টেলে যেতে তিন মাসের মতো লাগবে। এই তিন মাস খরচটা তো আঙ্কলই দেবে। রুপালি ভাবছিল যে, প্রথমে এই টাকাটাই শোধ করে দেবে সে।

বাইকের শব্দ পাওয়া গেল। রুপালি ঘাড় ঘুরিয়ে দেখল সুরজ আসছে। তার বাইকটা একটু পুরনো। হ্যান্ডেলের আয়নার ডান্ডায় ঝোলানো হেলমেট।

‘দেরি হল?’ সুরজ বাইক থামিয়ে জানতে চায়। রুপালি হাসে। এখনও অনেক সময় আছে। বাইকে চেপে ধূপগুড়ি যেতে বড় জোর কুড়ি মিনিট। আঁকাবাঁকা রাস্তা বলে তেমন স্পিড তোলা যায় না।

‘তিনটের স্টেটটা ধরব।’ রুপালি জবাব দেয়, ‘এখন তো মোটে পৌনে দুটো।’

‘আমাকে আবার আসতে হবে এখানে।’

‘কেন?’

‘সে শুনে কী করবে? আসতে হবে, আসব। তোমার মোবাইল আছে?’

রুপালির মোবাইল নেই। এতদিন দরকারই হয়নি।

‘নেই তো লাবনিদিকে বললে না কেন?’ সুরজ যেন অবাক হয়। ‘লাবনিদির কাছে দু’-তিনটে পুরনো সেট আছে। বললেই দিয়ে দিত একটা।’

‘আমি চাইতে পারব না।’ রুপালি লজ্জা পেয়ে বলে।

‘আমি দিলে নেবে? আমার এক্সট্রা আছে একটা।’

‘না না!’ রুপালির কান গরম হয়ে যায়। ‘তুমি কেন দেবে?’

‘কেন? আমাকে তুমি ফ্রেন্ড ভাবো না?’

রুপালি চুপ করে থাকে। তার সব ছিল। সব হারিয়ে গিয়েছে। কপালগুণে আঙ্কল, আন্টি আর রিঙ্কুদিকে পেয়েছে বটে, কিন্তু বন্ধু কি পেয়েছে? আলিপুরদুয়ারে সতু বিশ্বাসের পড়শি রমেশবাবুর ছেলেকে মনে হয়েছিল দাদার মতো। কিন্তু সে রুপালির বুকে হাত দিয়ে সব বিশ্বাস তছনছ করে দিয়েছে। দুধ দিতে আসা ছেলেটার সঙ্গে বন্ধুত্ব হয়েছিল একবার। সেও এক নির্জন দুপুরে রুপালিকে ঠেসে ধরেছিল দেওয়ালে। এসব কথা কি আঙ্কল বা রিঙ্কুদিকে বলা যায়? তার কোনও বান্ধবীও নেই। শহরের মেয়েরা তাকে কাজের লোকের বেশি ভাবেই না। রিঙ্কুদির বান্ধবীরাও না।

‘আমি তোমার ফ্রেন্ড হতে পারি না?’

রুপালি চোখ তুলে তাকাল সুরজের দিকে। সুরজ অবাক হয়ে বাইক থেকে নেমে রুপালির মুখের কাছে মুখটা নামিয়ে বলল, ‘আরে! কাঁদছ নাকি? লোকে দেখলে তো আমাকেই পেটাবে!’

সুরজের বলার মধ্যে একটা মজা ছিল। রুপালি এবার হেসে ফেলল ফিক করে।

‘আচ্ছা, দিয়ো তোমার মোবাইল।’

খুব অন্তর থেকে বলল রুপালি মুন্ডা।

বেলা তিনটের একটু আগে ধূপগুড়ি বাস স্ট্যান্ডে সুরজ যখন রুপালিকে নামিয়ে দিল, তখন শীতের বেলায় মলিনতা নেমে এসেছে। হাওয়ার বেগ বেড়েছে আগের তুলনায়। আর রুপালির মনে তখন অলৌকিক বিকেল। সে সুরজকে বলল, ‘বাই।’

আর আলতো করে ছুঁয়ে দিল সুরজের হাত।

(ক্রমশ)

শ্রীমতী ডুয়ার্স

নারীবাদী আন্দোলন শুধু কেতাবি নয়

দ্রুত পালটাচ্ছে সময়। বদলাচ্ছে নারী এবং পুরুষের সামাজিক প্রথাগত ভূমিকা। 'দ্য সেকেন্ড সেক্স' দিয়েই হয়ত নারীবাদী আন্দোলনকে উসকে দিয়েছিলেন সিমন দ্য বুভয়া। নারীবাদীরা 'ব্যান দ্য ব্রা' স্লোগান তুলেও আন্দোলন হেঁকেছিলেন। 'আ রুম অব ওয়ান'স ওন' লিখেছিলেন ভার্জিনিয়া উল্‌ফ। এত সব তত্ত্বায়নের বাইরেও কিন্তু আন্দোলন জারি আছে। তত্ত্বগত না হলেও খুব বেশি করে আছে জীবনসত্যে। নারীবাদী তত্ত্ব বা তকমাকে জাস্ট ওভারটেক করছে ব্যক্তিগত সক্রিয়তা। যে মেয়ে সিরিয়ায় গিয়ে আতঙ্কবাদীদের ডেরায় বসে ব্যাপারটা বুঝতে চাইছে, গর্দানের সম্ভাবনা জেনেও আইসিস নিয়ে ফিল্ম তুলে ফেলছে, আবার কেঁদুলির আখড়ায় বসে বাউল গাইছে, তাকে কি কেবলমাত্র আধুনিক নারীবাদী সংজ্ঞা দিয়ে দেখব? বড় বেশি কেতাবি হয়ে যাবে না? যে সাংবাদিক বান্ধবী মাওবাদীদের উপর লিখবে বলে ছত্তিশগড়, ঝাড়খণ্ড ছুটে বেড়াচ্ছে— তার সাহস, উদ্যোগ, প্রচেষ্টাকে খাটো করেও কি তাঁকে আটকে রাখা যাবে? যে ধনী কন্যাটি সোনার চামচ মুখে জন্মেও পথশিশুদের পাঠশালা নিয়ে মেতে আছে কিংবা যে মেয়ে নিষিদ্ধপল্লির ছেলেমেয়েদের আকাশ দেখতে শেখাচ্ছে— তাদের নিয়ে আমাদের ভাবনা এখনও যতখানি মঞ্চ জুড়ে, ততটা অন্তরের নয়। তাই কেতাবি নারীবাদ কিংবা নারীমুক্তির তত্ত্বায়নে ওদের বুঝতে যাওয়া স্রেফ বোকামি। সমাজজীবনকে ওরা নিজেদের জীবন দিয়েই বুঝে নিতে চাইছে। এই বোঝাপড়ায় ওদের নিজেদের কাজটাই হাতিয়ার। একই সঙ্গে ওদের জীবনযাপন আর কাজের ধরনধারণটাই আসল ব্যাপার। সেটা কতটা নারীবাদী বা মুক্তি আন্দোলন তা সময়ের হাতে থাকাই ভাল।

কত্থক নাচের প্রসারে পথে নেমে চাঁদাও তুলেছেন কুন্তলা

তাঁর হাতেই জলপাইগুড়িতে প্রথম নাচের স্কুল। রীতিমতো ঘাম ঝরিয়েই কত্থক শিক্ষাকেন্দ্র 'নৃত্যম' গড়ে তুলেছিলেন কুন্তলা রাহা। দেশভাগের পরই কুন্তলা জলপাইগুড়ি এসেছিলেন বাবা-মায়ের সঙ্গে। তখন তাঁদের ঠিকানা ছিল জলপাইগুড়ির নতুন পাড়ায়। যৌথ পরিবারে কাকিমা, জেঠিমা থাকা সত্ত্বেও একমাত্র পুরুষ প্রধান ছিলেন তাঁর বাবা। কিন্তু মেয়েদের শিক্ষার ব্যাপারে বাবার তেমন কোনও ছিল না। কিন্তু তাঁর মায়ের মত ছিল। তাই মেয়ের স্কুল বা শিক্ষার হাল ধরতে হয়েছিল মাকেই। তবে সবটাই স্বামীর চোখ আড়াল করে। স্কুলের ইউনিফর্ম কেনা থেকে শুরু করে বইপত্তরও লুকিয়ে রাখা হত। সৌদামিনী স্কুলে প্রাইমারির পর সদর বালিকা বিদ্যালয়ে বাকিটা। মামাবাড়ি সূত্রে সে সময় থেকেই শুরু হয় শিল্প-সংস্কৃতির প্রতি টান। ছোট্টবেলা থেকেই নাচতে ভালবাসে যে মেয়েটি, তাকে কি আটকে রাখা যায়! প্রসন্নদেব মহাবিদ্যালয়ে পড়বার সময় নৃত্য প্রদর্শনের সুযোগ পান ইন্দিরা গান্ধি এবং পদ্মজা নাইডুর সামনে। ছাইচাপা আগুন উষ্ণতার স্বাদ পেয়ে ঠিকরে বেরিয়ে এল বাইরে। প্রথমে 'ছন্দম'-এ ইন্দ্রদেব সান্যালের কাছে এবং পরবর্তীকালে অধ্যবসায়ের টানে কলকাতায় শ্রীলেখা মিত্রর কাছে তালিম। বিয়ের পর আবার বাধা। নৃত্যশিল্পী হতে শ্বশুরবাড়ির বিধিনিষেধ থাকতে পারে, কিন্তু নৃত্যশিক্ষিকা হলে কোনও বাধা নেই। পায়ের ঘাম মাথায় ফেলে গড়ে তুললেন কত্থক নৃত্য শিক্ষাকেন্দ্র 'নৃত্যম'। সে সময় জলপাইগুড়িতে নাচের স্কুল বলতে ওই একটিই। ফলে ছাত্রী পাওয়ার জন্য শিক্ষিকাকেই হাপিত্যেশে বসে থাকতে হয়েছে। অনেক সময়ে নাচের পাশাপাশি পেশা হিসেবে শিক্ষকতাও করেছেন। কিন্তু নাচই ছিল তাঁর ধ্যানজ্ঞান। মানুষ হিসেবেও কুন্তলা রাহা তুলনাবিহীন। অত্যন্ত স্বল্পভাষী, নম্র, ভদ্র— সব মিলিয়ে মাতৃসুলভ। তাঁর নাচের প্রতি যে নিষ্ঠা তা তাঁকে প্রতিষ্ঠা দিয়েছে, দিয়েছে তৃপ্তি। ডুয়ার্সের মেয়ে হয়ে উঠেছেন ডুয়ার্সের পরিজন। সবাই তাঁকে বসিয়েছেন অত্যন্ত সম্মানের আসনে। কুন্তলা রাহা যে সময়কার শিল্পী, তখন কোনও কিছুই এখনকার মতো এত সহজলভ্য ছিল না। তিনিই প্রথম নৃত্যজগতের দিকপালদের সঙ্গে জলপাইগুড়ির পরিচয় করিয়েছিলেন। রীতিমতো রাস্তায় নেমে অর্থ সংগ্রহ করে নিয়ে এসেছিলেন কেলুচরণ মহাপাত্র, সংযুক্তা পাণিগ্রাহীর মতো শিল্পীদের। তখনকার পক্ষে কাজটা মোটেই সহজ ছিল না। আসলে ঐকান্তিক ইচ্ছে নিয়ে 'নৃত্যম'কে দাঁড় করিয়েছেন। পাশে পেয়েছিলেন বারীণ সাহা (তবলা) ও প্রদোষ চৌধুরীকে (ম্যান্ডোলিন)। সকলে মিলে বহু কত্থক নৃত্যশিল্পীর জন্ম দিয়েছেন, যাঁরা আজ তাঁদের নিজ নিজ ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠিত। আজও তিনি থেমে যাননি। জনকোলাহল থেকে দূরে বসে নিরিবিলিতে আজও কাজ করে চলেছেন কুন্তলা।

> ছোট্টবেলা থেকেই নাচতে ভালবাসে যে মেয়েটি, তাকে কি আটকে রাখা যায়! প্রসন্নদেব মহাবিদ্যালয়ে পড়বার সময় নৃত্য প্রদর্শনের সুযোগ পান ইন্দিরা গান্ধি এবং পদ্মজা নাইডুর সামনে। ছাইচাপা আগুন উষ্ণতার স্বাদ পেয়ে ঠিকরে বেরিয়ে এল বাইরে।

গ্রন্থন সেনগুপ্ত

ডুয়ার্সের ডিশ

মাষকলাই চিকেন (মেচ ডিশ)

উপকরণ: ভাঙা মাষকলাই ডাল, টুকরো করে কাটা মুরগির মাংস, পেঁয়াজ, রশুন, আদা-লংকা বাটা, নুন, হলুদ।

প্রণালী: প্রেশার কুকারে ভাঙা মাষকলাই ডালটা পরিমাণমতো জলে দিয়ে ৩/৪টে সিটি দিয়ে নামিয়ে রাখতে হবে। সমস্ত বাটা, নুন, হলুদ দিয়ে মাংস মেখে কড়াইতে দিয়ে কষাতে হবে, সাধারণভাবে সবাই মাংস যেভাবে রান্না করে। মাংস ভালভাবে কষানো হয়ে গেলে এবার তাতে ওই সেদ্ধ করে রাখা মাষকলাই ডালটা ঢেলে দিতে হবে। খানিকক্ষণ ফুটলে থকথকে গ্রেভি-সহ মাষকলাই চিকেন তৈরি।

অন্ধলা তরকারি

উপকরণ: ভাল গন্ধযুক্ত আতপচাল গুঁড়ো, নুন, হলুদ, অর্দ্ধেক কোয়া রসুন, সামান্য খাবার সোডা।

প্রণালী: কড়াইতে জল ফুটতে শুরু করলে ১/২ চিমটি খাবার সোডা, ৩-৪টে কাঁচা লঙ্কা চেরা, স্বাদমতো নুন, হলুদ দিতে হবে। জলের রংটা লাল হয়ে যাবে। জল যখন টগবগ করে ফুটবে তখন চালের গুঁড়োটা ওর মধ্যে ঢেলে দিয়ে খুন্তি দিয়ে নাড়তে হবে। নাড়তে নাড়তে থকথকে হয়ে আসবে এবং কিছু কিছু দলা দলা বড়ার মতো হয়ে যাবে। নামানোর আগে রসুন থেঁতো করে ওর মধ্যে দিয়ে নামিয়ে ফেলতে হবে।

দীপাঞ্জলি রায়, চন্দ্রমারি, আলিপুরদুয়ার

শখের বাগান

বাড়ির যেখানে খুশি লাগান গন্ধরাজ

ঋতুরাজ বসন্ত বিদায় নিয়েছেন। মন খারাপ? না, প্রথমবার কষ্ট করে একটা ডাল পুঁতে দিন, বাড়ির যে কোনও জায়গায়। মাটিতে বা টবে। তবে রোদের জায়গা হলে ভাল হয়। হ্যাঁ, ঠিক ধরেছেন। গন্ধের রাজা, গন্ধরাজের একটা ডাল বর্ষায় লাগান। কাটিং পাউডার বা সার, কীটনাশক কিচ্ছু চাই না। আর্দ্র মাটিতে ডাল লাগালেই বছর ঘুরতে না ঘুরতেই চমৎকার সুবাসে অপনার মনপ্রাণ ভরে যাবে। তবে ফুল ফুটলে এক ধরনের ছোট মাছি আক্রমণ করে। কীটনাশকের দোকান থেকে একটা ফেরোমন ট্র্যাপ এনে ঝুলিয়ে দিন। সব মাছি ট্র্যাপে পড়বে। গুল্মজাতীয় গন্ধরাজ একবার লাগালে বহুদিন পর্যন্ত বেঁচে থাকে। ফুল ফোটা শেষ হলে ডাল ছেঁটে দিন। সেগুলোই আবার নিজে লাগান বা অন্যকে বিলিয়ে দিন।

কৃষ্ণচন্দ্র দাস

বন্ধ্যাত্ব
জনিত সমস্যার সর্বরকম সমাধান
CREATION
THE FERTILITY CENTRE
Evolution through Creation
খুশী যখন আপনার ঘরে করবে প্রবেশ
সেই মূহূর্তের স্বপ্নপূরণের সাথী
www.creationivf.com
আন্তর্জাতিক মানের IVF (টেস্ট টিউব বেবি) সেন্টার এখন শিলিগুড়িতে
+91-95641 70008 / +91-95641 50004
creationthefertilitycentre@gmail.com
Sony Centre, Basement Floor, Opp. Rishi Bhawan
Burdwan Road, Siliguri, Pin-734005

বৈশাখের অনুষ্ঠানে ঘরোয়া সাজের টিপস

গরম পড়া মানেই র‍্যাশ বেরনো, ধুলোতে অ্যালার্জি ইত্যাদি নানান রকমের সমস্যা। সে ক্ষেত্রে ত্বককে সতেজ রাখতে হলে টম্যাটো ব্লিচ অত্যন্ত উপকারী এবং সহজ একটা উপায়। টম্যাটো একটি ন্যাচারাল ব্লিচ। বিকেলের দিকে যখন শরীর ক্লান্ত হয়ে থাকে অথবা সকালে স্নানের আগে টম্যাটো গোল গোল চাকা চাকা করে কেটে সারা মুখে মেখে ১৫/২০ মিনিট রেখে ধুয়ে ফেলতে হবে। ত্বক ঝরঝরে লাগবে। এটি সপ্তাহে চার দিন করা যেতেই পারে। যাঁরা চাকরি করেন, তাঁদের ক্ষেত্রে প্রতিদিন করলেও কোনও ক্ষতি নেই। ব্লিচ করার পর অবশ্যই টোনার লাগাতে হবে এবং ড্রাই ও নর্মাল স্কিন হলে তারপর অবশ্যই ময়েশ্চারাইজার লাগাতে হবে। আর রোদ্দুরে বেরনোর ১৫ মিনিট আগে সানস্ক্রিন তো মাস্ট। এবার আসি, অনুষ্ঠানে বেরতে হলে কীভাবে মেকআপ করলে ভাল লাগবে, সে কথায়।

সকালের সাজ—

সকালবেলা কোনও অনুষ্ঠানে বেরতে হলে ১৫/২০ মিনিট আগে অবশ্যই সানস্ক্রিন লাগাতে হবে। তার আগে ক্লিনজিং মিল্ক দিয়ে ভাল করে মুখ পরিষ্কার করে নিয়ে টোনার লাগিয়ে নিতে হবে। এখানে একটি কথা বলে নেওয়া ভাল যে, সকালে উঠে রান্নায় হাত লাগানোর আগেও এই ক্লিনজিং, টোনিং এবং সানস্ক্রিন কিন্তু জরুরি। বেরনোর সময় সানস্ক্রিনের উপর সিসি ক্রিম বেস মেকআপ হিসেবে ব্যবহার করা যেতে পারে। তাতে অতিরিক্ত ট্যান কিংবা ত্বকের কালো কালো ছোপ ইত্যাদি ঢেকে যাবে। এই সিসি ক্রিমটি কেবলমাত্র নর্মাল এবং ড্রাই স্কিনের মহিলাদের জন্যই। তৈলাক্ত ত্বক হলে কখনওই সিসি ক্রিম মাখবেন না, বেস মেকআপ হিসেবে ফাউন্ডেশনই ব্যবহার করবেন। মনে রাখতে হবে, শুষ্ক এবং সাধারণ ত্বকের জন্য ক্লিনজিং এবং টোনিং-এর পর ময়েশ্চারাইজার ব্যবহার অত্যন্ত প্রয়োজনীয়।

সকালের সাজ যখন, তখন হালকা রঙের শাড়ির সঙ্গে খোলা চুল ভাল যাবে। সঙ্গে হালকা জুয়েলারি। মেরুন রঙের লিপস্টিক সব ধরনের ত্বকে মানিয়ে যায়, তাই বিবাহিতদের ক্ষেত্রে মেরুন লিপস্টিক আর ছোট মেয়েদের জন্য হালকা গোলাপি বেশ ভাল।

সন্ধেবেলার সাজ—

মুখ পরিচর্যার কথা যেমন বললাম, তেমনভাবেই করবতে হবে, কিন্তু সাজটা সকালের চাইতে অনেকটাই বদলে যাবে। একটু জমকালো শাড়ি, সেই সঙ্গে জাঙ্ক জুয়েলারি চলতে পারে। রাত্তিরে চোখে আইলাইনার, আইশ্যাডো, মাসকারা লাগাতে পারেন। তবে যাঁরা শ্যামবর্ণ, তাঁরা যেন মেরুন আইশ্যাডো ব্যবহার করেন। এবং যাঁরা ফরসা, তাঁরা শাড়ির রঙের সঙ্গে ম্যাচ করে আইশ্যাডো ব্যবহার করবেন। এখানে আর-একটা কথা বলে নেওয়া ভাল। ফাউন্ডেশনের ক্ষেত্রেও কিন্তু নিজের স্কিন কালারের সঙ্গে মানানসই ফাউন্ডেশন ব্যবহার করা উচিত। বাজারে অনেকই কিনতে পাওয়া যায়, যা খুশি কিনে লাগিয়ে ফেললেই চলবে না। নিজের স্কিন টোনটা আগে বুঝে নিতে হবে।

বিউটিশিয়ান: **কৃষ্ণা দে**

বাঙালিয়ানা রক্ষায় বারবার ফিরে আসুক পয়লা বৈশাখ

এবার বসন্ত বিদায়ের পালা। বসন্ত বিদায়ের সঙ্গে সঙ্গে প্রকৃতি তার রুদ্র রূপ মেলে আসে বৈশাখে। চৈত্রের শেষ হয় বাংলার লোক উৎসব গাজন দিয়ে। শিবকে কেন্দ্র করেই চলে এ উৎসব। ভক্তদের ঢাক, কাসর ও শিঙার আওয়াজে গাজনের সমারোহ টের পাওয়া যায়। মধু মাস হল শিব-পার্বতীর মিলনের মাস। পৌরাণিকমতে এ মাসেই নাকি হিমালয় কন্যা পার্বতী বা চণ্ডিকার সঙ্গে নীলকণ্ঠ শিবের বিবাহ অনুষ্ঠিত হয়েছিল। আর একে স্মরণ করেই পালিত হয় গাজন উৎসব। এই উৎসবের রেশ ধরেই বাংলা ও বাঙালি জীবনে যেটি আসে তা হল নববর্ষ বা নতুন বছর। আজও নতুনকে সমাদর করে বাঙালি এই সনাতন ঐতিহ্যকে বহন করে চলেছে। নববর্ষের শুরুতেই মঙ্গল কামনায় প্রথম যার শরণাপন্ন হতে হয়, তিনি হলেন সিদ্ধিদাতা গণেশ। সাংবাৎসরিক হিসেব-নিকেশ শেষে নতুন হালখাতা খোলেন ব্যবসায়ীরা গণেশ পুজোর মধ্য দিয়ে। বাণিজ্যে বসতি লক্ষ্মী। তাই অনেকে আবার এই দিনটিতে লক্ষ্মীপুজোও করে থাকেন। বাঙালি মননে যে নতুন ছোঁয়া লাগে তা নতুন পোশাক পরিচ্ছদেও ফুটে ওঠে। বিশেষ দিনটির জন্য রসে ও রসনাতেও বাঙালি আজও পিছিয়ে নেই।

আর নববর্ষের কথা উঠলেই যেটা বিশেষভাবে মনে পড়ে তা হল পঞ্জিকা বা পাঁজি। বাংলা পাঁজি বা পঞ্জিকার অদি মানুষ হলেন রাজা কৃষ্ণচন্দ্র। তিনিই হিসেব-নিকেশের সমতা রক্ষার জন্য অষ্টাদশ শতকে প্রথম পাঁজির সূচনা করেন। নিত্যকর্মের এই বইটিও বাঙালির সংস্কার ও ভাবনার সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। বাঙালি, বাংলার এই বিশেষ দিনটিতে বঙ্গ সংস্কৃতির নতুন অঙ্গে এখন পালা বদলের হাওয়া। তাই রীতি-রেওয়াজের বিস্তর ফারাক। সংস্কৃতির ঐতিহ্য কোথায় যেন হোঁচট খায়। গুরুজন প্রণাম, আলিঙ্গন, ইনটারনেটে মোবাইলের কল্যাণে চুকেবুকে যেতেই বসেছে। নববর্ষের প্রণাম জানিয়ে দু-ছত্র লেখা হলুদ পোস্ট কার্ডটি আর চোখে পড়ে না। দোকানে দোকানে হালখাতা করতে যাবার মধ্যেও যে সৌহার্দ্যপূণ মিলন, একে অপরের সঙ্গে আন্তরিকতার বিনিময় তা কিছুটা হলেও ম্লান। এখন সবটাই প্রথা নির্ভর। তবুও বছর বছর পয়লা বৈশাখ আসে। নববর্ষকে বরণ করতে

মাতে আপামর বাঙালি সমাজ। একদিনের জন্য হলেও মাল্টিকুইজিন ভুলে বাঙালিয়ানায় পাত পাড়ে। বিগত বছরের শোক, তাপ, হতাশা ভুলে নতুন করে শুভ দিনের আশায় বুক বাঁধে।

অঞ্জনা ভট্টাচার্য,

বাংলা নববর্ষে একটাই ভাবনা, আমরা কতটা বাঙালি? আদৌ কি বাঙালিত্ব আছে আমাদের মধ্যে? থাকলেও তা কতটা? এবার যে ১৪২৩, সেটাও হয়ত ঠিকঠাক বলতে পারবে না অনেক বাঙালি। গল্প-আড্ডা সব জায়গাতেই বাংলার মাঝখানে অনেকগুলো ইংরেজি আর হিন্দি শব্দের জট। ১ বৈশাখ, ২৫ বৈশাখ আর ২১ ফেব্রুয়ারি (এখানেও ইংরেজি ক্যালেন্ডারের হিসেব, যদিও ঘটনাটা বাংলার)— এই তিনটে দিনই কেবলমাত্র আমরা বাঙালিরা মেতে উঠি বাংলা বাংলা করে। সারা বছর মনে পড়ে না এই ভাষা কিংবা এর ঐতিহ্যকে ধরে রাখার কথা। সেটা হলে প্রকৃত অর্থেই গড্ডলিকাপ্রবাহ থেকে খানিকটা দূরে থেকে নিজেদের সত্তাকে বাঁচিয়ে রাখতে সচেষ্ট হতে পারতাম আমরা।

মায়া চ্যাটার্জি

মেঘ পিয়োন

হার না মেনে ট্রাই এগেইন

১৯৯৪ সাল, তখন একাদশ শ্রেণিতে পড়ি। আমার এক বন্ধু সদর বালিকা বিদ্যালয়ে পাঠরতা এক ছাত্রীর একতরফা প্রেমে হাবুডুবু খাচ্ছে, অথচ কোনওভাবেই মনের কথাটা প্রকাশ করতে পারছে না। একদিন ঠিক হল তাকে চিঠি দেওয়া হবে। পরিকল্পনা অনুযায়ী সকাল ১০টা থেকে সাইকেল নিয়ে সমবায়িকার সামনে অপেক্ষা করছি সেই চরম মুহূর্তটির জন্য। অবশেষে গলির মাথায় দেখি রিকশায় সেই রাজকন্যে বসে আছে। রিকশা কিছুটা এগিয়ে যেতেই তার পিছু নেওয়া শুরু হল। এবার সেই অমূল্য সম্পদ মেয়েটির হাতে দেওয়ার পালা। টেনশনে বন্ধুর মুখ-চোখ লাল হয়ে গেলেও আমরা তাকে সাহস জোগালাম। মুক্তা ভবনের সামনে রিকশার হুড ধরে সেই বন্ধু কোনওমতে চিঠিটি মেয়েটির ব্যাগের উপর দিয়ে দিল। কিন্তু এ কী! এত আশা করে দেওয়া চিঠিখানি সে সঙ্গে সঙ্গেই রাস্তায় ফেলে দিল। আমরা হতভম্ব, স্তম্ভিত। এমন সময় এক ভদ্রলোক সেই চিঠিখানি সযত্নে কুড়িয়ে এনে আমার বন্ধুর হাতে তুলে দিয়ে বললেন, ভাই, হার মেনে নিয়ো না। ট্রাই এগেইন।

উজ্জ্বল সেন, জলপাইগুড়ি

টেক টক

কম্পিউটারকে কীভাবে গতিশীল রাখবেন?

যদি আপনার কম্পিউটার স্লো হয়ে আপনার মূল্যবান সময় নষ্ট করে, তাহলে কী করবেন?

১) সমস্ত Background Process বন্ধ করুন— ক) Right Click on the Task Bar > Star Task Manager > Process. এবার যে Process-টা বন্ধ করতে চান, সেটাতে Right Click করে End Process করুন।

যদি আপনার PC Start হতে বেশি সময় নেয় তবে— খ) Windows-এর নিজস্ব Utility আছে Startup Process Enable/Disable করার জন্য। To access it, go to Start > Run > type ‘MSCONFIG’ and click OK.

এবার Startup Tab-এ গিয়ে যে Item-গুলো প্রয়োজন নেই, সেগুলো Select করে Disable করে দিন। System সচল রাখতে কিছু প্রয়োজনীয় Application কখনও Disable করবেন না। যেমন Antivirus, Common user interface ইত্যাদি।

২) Temporary File Delete করুন।

ক) Go to Start > Run > type ‘%Temp%’ and click OK. এবার Temp Folder-এর সমস্ত ফাইল ও ফোল্ডার সিলেক্ট করে Delete করে দিন। খ) Go to Start > Run > type ‘cleanmgr’ and click OK. Select C:/drive এবং কিছুক্ষণ বাদে junk ফাইলের একটা তালিকা দেখাবে, সেখান থেকে সব ক’টা Select করে, OK button ক্লিক করলে Drive পরিষ্কার হওয়া শুরু হবে।

৩) আপনার PC নিয়মিত পরিষ্কার করুন। CCleaner একটি ফ্রি সফটওয়্যার, Download করে Install করুন।

৪) অপ্রয়োজনীয় সফ্‌টওয়্যার ডিলিট করে দিন। Go to Control Panel > Program > Uninstall a Program. যে প্রোগ্রামগুলো কাজে লাগছে না, সেগুলো Uninstall করে দিন।

৫) Defrag you Drive: মাসে অন্তত একবার করে Defrag করুন। Go to > Start > All Programs > Accessories > System Tools > Disk Defragment. Then Click on Defragment Disk.

৬) সবার শেষে বলি, Desktop অনাড়ম্বর রাখুন। Icon ফাইল যত কম হবে, ততই মঙ্গল। Go to Control Panel > System and Security > System. এবার Advanced System Settting Click করুন। এবার Advanced Tab-এর Performance -এর Setting Click করুন। তারপর Visual Effects Tab-এর থেকে 'Adjust for best performance' Select করে OK করে দিন।

অমিতেশ চন্দ

ডাক্তারের ডুয়ার্স (২য় ভাগ)

শিশুর বদ অভ্যাস ছাড়াবেন কীভাবে?

আঙুল চোষা, ঠোঁট কামড়ানো, দাঁত কিড়মিড় করা— এমন কিছু বাজে অভ্যাস বাচ্চাদের মধ্যে থাকেই। এই অভ্যাসগুলো থেকে গেলে বাচ্চাদের মাড়ি নরম হয়, দাঁতের জায়গা বদলে গিয়ে এলোমেলো উঁচু দাঁত, উঁচু মাড়ি তৈরি হয়। বাচ্চার কথা বলাতেও অনেক সময় জড়তা তৈরি হয়। কিছু অভ্যেস, যেগুলো বাচ্চা নিজে থেকে সহজেই ধরতে বা ছেড়ে দিতে পারে, তাকে আমরা বলি নন-কমপালসিভ। কিছু আছে কমপালসিভ হ্যাবিট বা অভ্যেস, যেগুলো ছাড়াতে গেলে বাচ্চা অনেক সময় নিরাপত্তাহীনতায় ভোগে। এই অভ্যেসগুলোর কারণ খাবার খাওয়ানোর পদ্ধতি বাচ্চার ক্ষেত্রে ঠিক না হওয়া। এই বদভ্যাসগুলো হলে বাচ্চাদের ক্ষেত্রে তা ছাড়ানোর উপায় হল— (ক) কাউন্সেলিং (কিন্তু বাচ্চা অভ্যাস ছাড়তে না পারলে তাকে অপমান করা উচিত নয়।) (খ) ডেন্টাল অ্যাপ্লায়েন্সেস ব্যবহার করা।

বাচ্চা আঙুল চুষলে সামনের দাঁত, মাড়ি যেমন উঁচু হয়, তেমনই দাঁত ক্ষয়ে যায়। আপনি নিজেই এই অভ্যেসগুলো ছাড়াতে পারবেন। আপনার বাচ্চার মধ্যে অভ্যেসগুলি দেখলে ঘাবড়ে না গিয়ে প্রথমে বাচ্চাকে আদর করে বোঝান। উপহার দিয়ে তাকে অভ্যেসগুলো ছাড়তে সাহায্য করুন। প্রয়োজন হলে আপনার ডেন্টিস্টের সাহায্য নিন। এ ছাড়াও বাচ্চার যদি কথায় জড়তা থাকে বা দাঁতের গোড়া থেকে রক্ত পড়ে, তবে দেরি না করে তাড়াতাড়ি ডাক্তারের পরামর্শ নিন।

ড. পায়েল আগরওয়াল চক্রবর্তী

EKHON DUARS, Vol-3, Issue-1/2, WBBEN/2014/56733, Rs. 12 Only

রংরুট ও এখন ডুয়ার্সের বই

এখন ডুয়ার্স-এর দুটি গুরুত্বপূর্ণ সংকলন

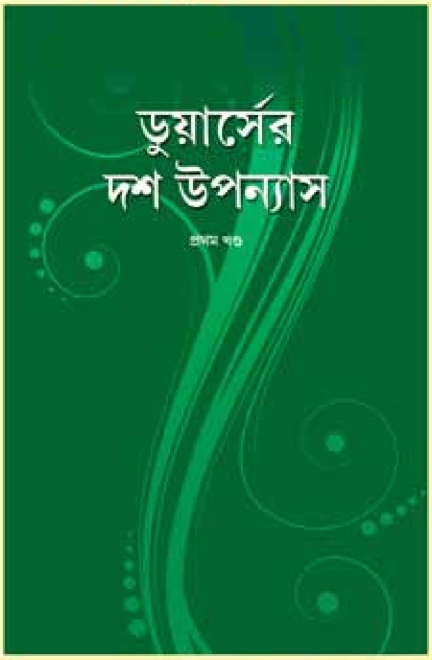
ডুয়ার্সের
দশ উপন্যাস
প্রথম খণ্ড

ডুয়ার্সের দশ উপন্যাস
মূল্য ২৫০ টাকা।

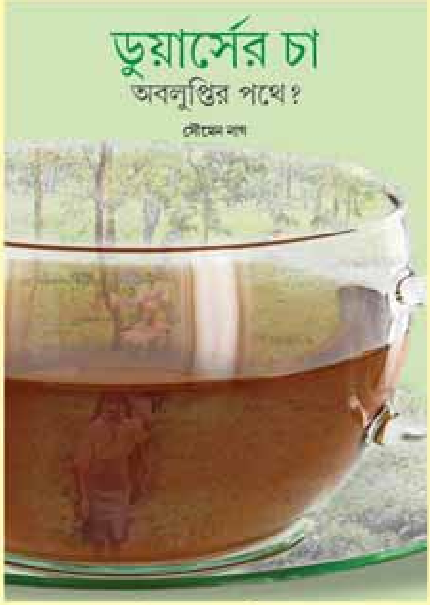
ডুয়ার্সের চা
অবলুপ্তির পথে?
সৌমেন নাগ

ডুয়ার্সের চা অবলুপ্তির পথে?
সৌমেন নাগ মূল্য ১৫০ টাকা।

সবকটি বইয়ের ডুয়ার্সে প্রাপ্তিস্থান
আড্ডাঘর। মুক্তা ভবন, মার্চেন্ট রোড, জলপাইগুড়ি

পাসপোর্ট
প্রতিবেশীদের
পাড়ায়

পাসপোর্ট প্রতিবেশীদের পাড়ায়
দীপিকা ভট্টাচার্য
মূল্য ১৫০ টাকা

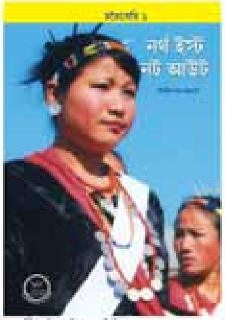
নর্থ ইস্ট
নট আউট

নর্থ ইস্ট নট আউট
গৌরীশংকর ভট্টাচার্য
মূল্য ১৫০ টাকা

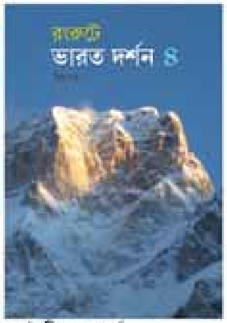
রংরুটে
ভারত দর্শন ৪

রংরুটে হিমালয় দর্শন।
মূল্য ২০০ টাকা

আমাদের পাখি
তাপস দাশ, উজ্জ্বল ঘোষ
মূল্য ১০০০ টাকা, বইমেলায় ৬৯০ টাকা

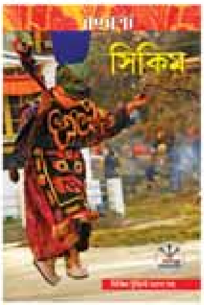

রংরুট সিকিম। রংরুটে প্রকাশিত সিকিম সম্পর্কিত রচনার সংকলন দ্বিতীয় পরিবর্ধিত সংস্করণ। সঙ্গে সিকিমের পূর্ণাঙ্গ টুরিস্ট ম্যাপ।
মূল্য ২০০ টাকা

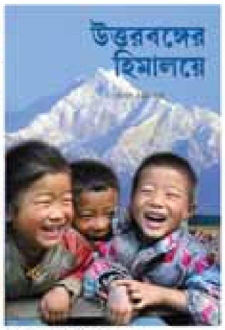
উত্তরবঙ্গের
হিমালয়ে

উত্তরবঙ্গের হিমালয়ে
প্রদোষ রঞ্জন সাহা
দার্জিলিং ও কালিম্পং পাহাড়ের নানা প্রত্যন্তে ঘুরে বেড়াবার গাইড। মূল্য ২০০ টাকা

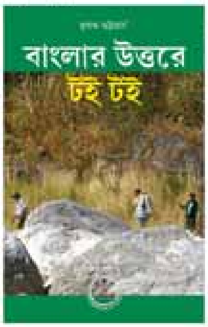
বাংলার উত্তরে
টই টই

বাংলার উত্তরে টই টই
মৃগাঙ্ক ভট্টাচার্য
মূল্য ১০০ টাকা।

আমেরিকার
দশ কাহন

আমেরিকার দশ কাহন
আমেরিকা বেড়াবার একমাত্র গাইড শান্তনু মাইতি। মূল্য ১২০ টাকা

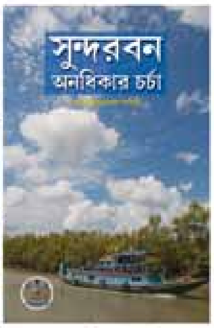
সুন্দরবন
অনধিকার চর্চা

সুন্দরবন অনধিকার চর্চা
জ্যোতিরিন্দ্রনারায়ণ লাহিড়ী
মূল্য ১৫০ টাকা

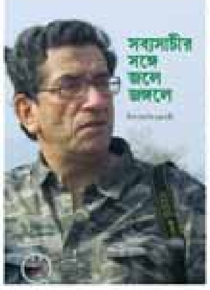
সব্যসাচীর
সঙ্গে
জলে
জঙ্গলে

সব্যসাচীর সঙ্গে জলে জঙ্গলে
দীপজ্যোতি চক্রবর্তী
সব্যসাচী চক্রবর্তীর সঙ্গে দেশের নানা জঙ্গলে ঘুরে বেড়াবার কাহিনি
মূল্য ১৫০ টাকা

সব্যসাচীর সঙ্গে
জলে জঙ্গলে

দ্বিতীয় খণ্ডে রয়েছে সব্যসাচীর সঙ্গে দেশের নানা জঙ্গল ও আফ্রিকার দুই দেশ, কেনিয়া ও তানজানিয়া ঘুরে বেড়াবার কাহিনি। মূল্য ১৫০ টাকা

রংরুট
পশ্চিমবঙ্গ

রংরুট পশ্চিমবঙ্গের জেলা ভিত্তিক পর্যটন গাইড
মূল্য ১০০ টাকা

PRINTER & PUBLISHER : PRADOSH RANJAN SAHA. On behalf of owner Mr. Pradosh Ranjan Saha, printed at Albatross Graphic Solution Pvt. Ltd., published at 18/7 Dover Lane, Kolkata 700029, Editor - Pradosh Ranjan Saha.